POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ يُزَكُّوۡنَ اَنۡفُسَهُمۡ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّىۡ مَنۡ يَّشَآءُ وَلَا يُظۡلَمُوۡنَ فَتِيۡلًا ○

তুমি কি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যাহারা নিজদিগকে পবিত্র বলিয়া দাবি করে? বরং আল্লাহ্ যাহাকে চাহেন পবিত্র করেন, এবং তাহাদের উপর খেজুর-বীজের ঝিল্লী পরিমাণও যুলুম করা হইবে না।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৫০)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدۡ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 8

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 12

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 23 শে মার্চ, 2023 30 শাবান 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

ফজর ও এশার নামাযের গুরুত্ব

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: মুনাফিকদের জন্য ফজর এবং এশার নামাযের থেকে বেশি ভারি আর কোনও নামায নেই। তারা যদি জানত যে এই নামায দ্বয়ে কি পুণ্য রয়েছে তবে, হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই নামাযে আসত। আমার মনে এই চিন্তার উদ্রেক হল যে, মুয়াজ্জিনকে ইকামত দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে এক ব্যক্তিকে ইমামতি করতে বলি। অতঃপর আগুন নিয়ে এসে সেই সব লোকেদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিই, যারা এখনও নামাযের জন্য বের হই নি।

(সহী বুখারী, বাব ফযলুল ইশা ফিল জুমাআ)

● হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফিরিশতারা রহমতের দোয়া করতে থাকে যতক্ষণ সে জায়ে নামাযে থাকে, তবে শর্ত হল সে যেন ওজুহীন না হয়ে পড়ে। (ফিরিশতারা বলে) হে আল্লাহ্! একে ক্ষমা কর! হে আল্লাহ্! এর উপর দয়া কর। তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি ততক্ষণ নামাযেই থাকে, যতক্ষণ সে নামাযের জন্য থেমে থাকে। তবে নামায ছাড়া অন্য কোনও বিষয় যেন তাকে নিজের পরিবারের দিকে ফিরে আসতে বাধা না দেয়।

(সহী বুখারী, বাব মান জালাসা ফিল মসজিদ)

জুমআর খুতবা, ২৭ জানুয়ারী, ২০২৩
সফর বৃত্তান্ত (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রশ্নোত্তর পর্ব

আমি আমার শক্তিশালী নিদর্শন দ্বারা স্পষ্টরূপে দেখিয়েছি যে, জীবন্ত আশিস ও নিদর্শন কেবল ইসলামের জন্যই নির্ধারিত। ইসলাম অপরের প্রদীপের মুখাপেক্ষী নয়, বরং নিজেই প্রদীপ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

দেখ এবং মনোনিবেশ সহকারে শোন! একমাত্র ইসলামের মধ্যেই আশিস রয়েছে আর তা মানুষকে হতাশ ও ব্যর্থ হতে দেয় না। এর প্রমাণ হল, আমি এর আশিসরাজি এবং জীবন এবং সত্যতার জন্য নমুনা হিসেবে দণ্ডায়মান হয়েছি। কোনও খৃষ্টান দেখাতে পারবে না যে উর্দ্ধলোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। যেটি ঈমানের নিদর্শন আর মোমেন খৃষ্টানদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে যে, পর্বতকে নির্দেশ দিলে তা স্থান চ্যুত হবে। এখন পাহাড় তো দূরের কথা এমন কোনও খৃষ্টান নেই যে এক উল্টো জুতোকে সোজা করে দেখাতে পারে। কিন্তু আমি আমার শক্তিশালী নিদর্শন দ্বারা স্পষ্টরূপে দেখিয়েছি যে, জীবন্ত আশিস ও নিদর্শন কেবল ইসলামের জন্যই নির্ধারিত। আমি অজস্র ইশতেহার দিয়েছি আর একবার ষোলো হাজার ইশতেহার প্রকাশ করেছি। এখন মিথ্যা মোকাদ্দমা ও হত্যার অভিযোগ আরোপ করা ছাড়া এদের হাতে কিছুই নেই। এখন তারা নিজেদের পক্ষ থেকে আমাকে অপদস্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র করবে, প্রিয় খোদার বান্দা কিভাবে অপদস্ত হতে পারে। যারা আমার জন্য লাঞ্ছনা চেয়েছে, সেই লাঞ্ছনা থেকেই খোদা আমার জন্য সম্মানের পথ বের করেছেন। ذٰلِكَ فَضۡلُ اللّٰهِ يُؤۡتِيۡهِ مَنۡ يَّشَآءُ দেখ! যদি ক্লার্কের মুকাদ্দমা না হত তবে আমার সসম্মানে মুক্তিলাভের ইলহামটি কিভাবে পূর্ণ হত, যা মোকাদ্দমার পূর্বে শত শত মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল। একমাত্র ইসলামের হাতেই নিদর্শন ও প্রমাণ রয়েছে। ইসলাম অপরের প্রদীপের মুখাপেক্ষী নয়, বরং নিজেই প্রদীপ। এর প্রমাণ এতটাই সুস্পষ্ট যে, এর নমুনা অন্য কোন ধর্মে নেই। বস্তুত ইসলামের কোনও শিক্ষা এমন নেই যার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫৪)

আমি সব সময় একথা ভেবে আশ্চর্য হই যে, কোনও মুসলমানও কি কখনও কবরে সিজদা করতে পারে?

وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِيۡثَاقَ بَنِىۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ لَا تَعۡبُدُوۡنَ اِلَّا اللّٰهَ

সূরা বাকারার ৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

এই আদেশাবলী বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইহুদীরা সেগুলি গ্রাহ্য করতো না; স্বজন থেকে বিজন, প্রত্যেকের সঙ্গে তাদের দুর্ব্যবহার ক্রমশ প্রকাশ হয়ে পড়ছিল। এমনকি তাদের মধ্যে কিছু মানুষ হযরত আযীরকে খোদার পুত্র আখ্যায়িত করতে শুরু করেছিল। যেমন, ইয়েমেনের দিকে বসবাসকারী ইহুদীদের সিদ্দুকী ফির্কা এই শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল এবং কিছু মানুষ উলেমাদের প্রত্যেক আদেশকে খোদার ওহী হিসেবে বিশ্বাস করত এবং নিজেদের ঐশী গ্রন্থের আদেশাবলীকে পেছনে ফেলে রাখত। এতীম ও মিসকীনদের প্রতি তারা সদাচারী ছিল না। এবং তাদের মধ্যে মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভুতি ছিল না। ইবাদতের বিষয়ে অলসতা প্রদর্শন করত এবং যাকাতকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করত। যেমন বর্তমান যুগের মুসলমানেরা একদিকে মুসলমান হওয়ার দাবি করে, কিন্তু অপরদিকে ইহুদীদের সম্পর্কে খোদা তা'লা যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে সেগুলি সবই পাওয়া যায়। ইহুদীদের কাছে কেবল এই অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল যে তারা যেন খোদা তা'লা ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত না করে। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি খোদা এত বেশি করেছেন যে,তিনি ইসলামের ভিত্তিই রেখেছেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র উপর। অর্থাৎ এর উপর যে খোদা ছাড়া কোন উপাস্য নেই, যিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সমস্ত কাজ নিজেই করতে সক্ষম। তাঁর কারো সাহায্যের মোটেই প্রয়োজন নেই। কিন্তু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র উপর ইসলামের ভিত্তি রাখা সত্ত্বেও আজ মুসলমানেদের মধ্যে এত বেশি শিরক পাওয়া যায় যে, এর তুলনায় অন্যান্য জাতির মধ্যে অনেক কম পরিমাণে শিরক রয়েছে। মুসলমানেরা কবরে কোন প্রকার বাধা ছাড়া এমনভাবে সেজদা করে যে খোদার সামনে সেজদাকারী এবং তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না। আমি সব সময় আশ্চর্য হই যে, কোনও মুসলমানও কি কখনও কবরে সিজদা করতে পারে? আর সাক্ষ্য প্রদান করা সত্ত্বেও একথা বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু একবার আমরা যখন কয়েকজন সঙ্গী ভারতে ইসলামী মাদ্রাসা দেখার উদ্দেশ্যে লখনউ যাই, তখন সেখানে ফিরিঙ্গি মহল মাদ্রাসা দেখে আমি পুলকিত হই। যোগ্য এবং বিদ্বান শিক্ষক ছিলেন সেখানে। ছাত্ররাও মেধাবী ও বিচক্ষণ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এই মাদ্রাসা এবং আরও কিছু মাদ্রাসা দেখার

(এরপর ৮ পাতায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র শতবার্ষিকি জুবিলী

‘আজ লাজনা ইমাউল্লাহ্‌ সংগঠনটি স্থাপনার ১০০ বছর পূর্ণ হয়েছে। লাজনাদেরও একথা মনে রাখতে হবে যে, এই একশ বছরে লাজনারা কতটা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পেরেছে, নিজেদেরকে বয়আতকে স্বার্থক করে তুলতে পেরেছে এবং এ বিষয়ে চেষ্টা করেছে এবং কতটা নিজেদের সন্তান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষাকারী হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছে”

১৯২২ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ এই সংগঠনের ১০০ বছর পূর্ণ হয়েছে। সারা বিশ্বে আহমদী মহিলা ও বালিকারা তাদের সংগঠনের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে শতবার্ষিকি জুবিলি উদযাপন করছে। কাদিয়ান এবং ভারতের লাজনারাও পূণ উদ্যমে এই অনুষ্ঠান উদযাপন করছে। তাহাজ্জুদের নামায, ইবাদত, ইজলাসের আয়োজন, মিষ্টি বিতরণ, বাড়ি এবং মসজিদে আলোকসজ্জা, পশু কুরবানী, দারিদ্রপীড়িতদের মাঝে ফল বিতরণ, গণ ভোজ ইত্যাদি কর্মসূচিত পালিত হয়। কাদিয়ান দারুল আমান-এ সর্বত্র এই নিয়ে গুঞ্জন চলছে। প্রতিটি বাড়ি বৈদুতিক বাতিতে আলো ঝলমল করছে। চতুর্দিকে উৎসব ও আনন্দের পরিবেশ।আলহামদো লিল্লাহ। ১৫ই জানুয়ারী থেকে ভারতে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে এবং দুপুরের পর কাদিয়ানে মরকাযীভাবে জলসার আয়োজন হয়। অর্থাৎ কাদিয়ান দারুল আমান-এ জলসা দুপুরের পর অনুষ্ঠিত হয়, লাইভ স্ট্রিমিং-এর মাধ্যমে সমগ্র ভারতের মজলিস গুলিতে এই অনুষ্ঠান দেখানো হয়।

লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটি ঠিক এইরূপ। সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১৯২২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কাদিয়ানের মহিলাদের নামে একটি চিঠি লেখেন। পত্রে তিনি তাদেরকে নিজেদের একটি সংগঠন তৈরী করার আহ্বান জানান এবং সেই সংগঠনের কাজ এবং উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করেন। কয়েকটি আধিকারিক বিষয় বাদ দিয়ে যার সারমর্ম এই যে, এই সংগঠনের অধীনে আহমদী মহিলারা ইসলামের ভালবাসা এবং প্রচারের জন্য উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে। এর জন্য তারা জ্ঞান অর্জন করবে, বিশেষ করে ধর্মীয় জ্ঞান। আর সেই জ্ঞান অন্যদের মাঝে প্রচার করবে। ধর্মের জ্ঞান অর্জন করে নিজ সন্তান সন্ততির এমনভাবে তরবীয়ত করবেন যে, তাদের হৃদয়ও যেন ইসলামের ভালবাসায় আপ্লুত থাকে আর ইসলামের সেবার জন্য সদা তৎপর থাকে। সন্তানের তরবীয়ত একজন আহমদী মহিলার এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, হুযুর (রা.) - এর এই নির্দেশটি অবিকল তুলে ধরছি। তিনি (রা.) বলেন-

‘শিশুদের তরবীয়তের ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্ব বিশেষভাবে অনুধাবন করা, তাদেরকে ধর্মের বিষয়ে উদাসীন, হতাশ ও অলস না বানিয়ে চনমনে, বিচক্ষণ, কষ্ট সহিষ্ণু হিসেবে তৈরী করা এবং ধর্মের খুঁটি নাটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা তোমাদের জন্য জরুরী। এবং তাদের মাঝে খোদা, রসুল, মসীহ মওউদ (আ.) খলীফাগণের প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য তৈরী কর। ইসলামের স্বার্থে এবং এর অভিপ্রায় অনুসারে নিজেদের জীবন পারিচালিত করার উদ্যম তৈরী কর এবং এই কাজ সম্পাদনের জন্য পরিকল্পনা করে তা বাস্তবায়িত কর।

(সোয়ানেহ, ফযলে উমর, ২য় খণ্ড, পৃ:৩৫৮)

হুযুর (রা.) চিঠির শেষে লেখেন- যে সমস্ত বোনেরা এই চিন্তাধারার সমর্থক এবং আমি যে কথাগুলি বলেছি যারা সেগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, তাদেরকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, আসুন এই উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ শুরু করুন এবং আমাকে অবগত করুন যাতে দ্রুত কাজ শুরু করা যায়। ’ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর এই নির্দেশ পেয়ে কাদিয়ানের ১৭জন মহিলা নিজেদের নাম লিখে স্বাক্ষর করে পাঠায়। ১৯২২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর এই ১৭জন সাক্ষরকারী মহিলা হযরত উম্মুল মোমেনীন আম্মা জান নুসরত জাহাঁ বেগম সাহেবা (রা.)-এর বাড়িতে একত্রিত হন যেখানে হুযুর (রা.) যোহরের নামাযের পর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এই বক্তব্যে তিনি যথারীতি মহিলাদের একটি সংগঠন স্থাপনার ঘোষণা করে এর নাম রাখেন ‘লাজনা ইমাউল্লাহ্‌’।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) -এর উদ্বোধনী ভাষণের পর লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র সদস্যারা সর্বসম্মতভাবে উম্মুল মোমেনীন হযরত আম্মা জান কে এই সংগঠনের সভাপতিত্বের দায়িত্বভার গ্রহণের আবেদন করেন। হযরত উম্মুল মোমেনীন-এর সভাপতিত্বে এই ঐতিহাসিক সভা শুরু হয়, কিন্তু শুরুতেই হযরত খলীফাতুল মসীহ সানীর প্রথমা স্ত্রী হযরত সৈয়্যদা উম্মে নাসের (রা.)-এর হাত ধরে অত্যন্ত স্নেহভরে নিজের স্থানে তাঁকে সভাপতির আসনে বসিয়ে দেন আর সভার পরের অংশ তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। হযরত সৈয়্যদা উম্মে নাসের (রা.) আমৃত্যু অথাৎ ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এই পদে আসীন থাকেন। সভাপতিত্বের বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়ার পর প্রথম জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে নির্বাচিত হনহযরত আমাতুল হাই সাহেবা। তিনি হলেন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর দ্বিতীয়া স্ত্রী, হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর কন্যা এবং হযরত সুফি আহমদ জান লুধিয়ানবী (রা.)-এর দৌহিত্রি।

কাদিয়ান দারুল আমান থেকে ১৭জন সদস্যা নিয়ে শুরু হওয়া এই সংগঠনটি আজ সারা বিশ্বে বিস্তৃতি লাভ করেছে আর এর সদস্যা সংখ্যা কয়েক লক্ষ। লাজনা ইমাউল্লাহ্‌ সংগঠন সারা বিশ্বে অসাধারণ কাজ করেছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে তারা পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। মসজিদ ফযল লন্ডন, মসজিদ মুবারাক হল্যান্ড, মসজিদ নুসরাত জাহাঁ কোপেনহেগন- এই মসজিদগুলি কেবলমাত্র আহমদী মহিলাদের চাঁদাতেই নির্মিত হয়েছে। এরপরও আরও অনেক মসজিদ শুধু লাজনাদের চাঁদাতেই তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। তারা আনসার এবং খুদ্দামদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রত্যেক নির্মাণ কাজে এবং প্রকল্পে তারা অংশগ্রহণ করছে। নিজেদের গহনাগাটি নির্দ্বিধায় তারা চাঁদা হিসেবে দান করে দেয় আর নিজেদের সন্তানদেরকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করে দেয়। এখানে লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র সংগঠনের মহৎ কাজের বর্ণনা দেওয়ার অভিপ্রায় নেই। তবে অ-আহমদীদের দুটি মন্তব্য নিম্নে দেওয়া হল। এই সংগঠনের তখন সবে চার বছর হয়েছে। তখন থেকেই এই সংগঠন অ-আহমদীদের উপর নিজেদের প্রভাব ফেলতে শুরু করে। ‘সীরাত’ আন্দোলন খ্যাত মৌলানা আব্দুল মাজীদ কুরায়েশী অমৃতসর থেকে প্রকাশিত ‘তানজীম’ পত্রিকায় ২৬ শে ডিসেম্বর, ১৯২৬এর সংখ্যায় লেখেন-

‘লাজনা ইমাউল্লাহ্‌ কাদিয়ান আহমদী মহিলাদের একটি সংগঠন। এই সংগঠনের অধীনে সর্বত্র মহিলাদের ইসলাহি মজলিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর এইরূপে পুরুষদের পক্ষ থেকে যে সব অভিযান শুরু হয় সেগুলি মহিলাদের সমর্থনের জোরে সফল করে তোলা হয়। এই আঞ্জুমানের সমস্ত মহিলাকে জামাতের উদ্দেশ্যের সঙ্গে ব্যবহারিকভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। মহিলাদের ঈমান পুরুষদের তুলনায় বেশি বিশুদ্ধ ও একনিষ্ঠ হয়ে থাকে। মহিলারা ধর্মীয় ভাবাবেগকে মহিলাদের তুলনায় বেশি আগলে রাখতে পারে। লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র যা কিছু কর্মতৎপরতার রিপোর্ট পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে তা থেকে বোঝা যায় যে, আহমদীদের ভবিষ্যত প্রজন্ম বর্তমান প্রজন্মের থেকে বেশি সুদৃঢ় এবং উদ্যমী হবে। আর আহমদী মহিলারা এই উদ্যানটিকে সতেজ রাখবে যা কালের প্রবাহে নিজের প্রাকৃতিক সতেজতা হারিয়ে নিস্প্রাণ হয়ে যাওয়া অনিবার্য ছিল।”

আর্য সমাজীদের এক খ্যাতনামা পত্রিকা ‘তেজ’ ১৯২৭ সালের ২৫ শে জুলাই-এর সংখ্যায় লেখে-

‘আমরা মহিলা সমাজ গঠন করে আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগছি। কিন্তু আমাদের জানা থাকা উচিত যে, প্রত্যেকটি স্থানে আহমদী মহিলাদের যথারীতি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত আছে। আর যে সব কাজ তারা করছে তার তুলনায় আমাদের নারী সমাজের কোনও অস্তিত্বই নেই। ‘মিসবাহ’ পাঠ করলে জানা যাবে যে, আহমদী মহিলা ভারত, আফ্রিকা, আরব, মিসর, ইউরোপ এবং আমেরিকায় কিভাবে এবং কত শত কাজ কাজ করছে। তাদের ধর্মীয় চেতনা এতটাই প্রশংসনীয় যা দেখে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত। কয়েক বছর পূর্বে তাদের নেতা একটি মসজিদের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার চাঁদা দেওয়ার আবেদন করেন এবং সেই সঙ্গে শর্ত বেঁধে দেন যে, এই টাকা যেন কেবল মহিলারাই দেয়। মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে সেই সব মহিলারা পঞ্চাশ হাজার টাকার পরিবর্তে পঞ্চান্ন হাজার টাকা দান করে দেন।”

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) জলসা সালানা কাদিয়ান ২০২২-এর তৃতীয় দিনের সমাপনী ভাষণে বলেন-

‘আজ লাজনা ইমাউল্লাহ্‌ সংগঠনটি স্থাপনার ১০০ বছর পূর্ণ হয়েছে। লাজনাদেরও একথা মনে রাখতে হবে

এরপর ৯ পাতায়....

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

তোমাদের জন্য এক অপরিহার্য শিক্ষা হলো, পবিত্র কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুর মতো ফেলে রেখো না। এতেই তোমাদের জীবন নিহিত। যারা কুরআনকে সম্মান করবে তারা ঊর্ধ্বলোকে সম্মান লাভ করবে।”

বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা’লা মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত সেবককে পবিত্র কুরআনের প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন, পবিত্র কুরআনের সুরক্ষার জন্য প্রেরণ করেছেন। তাঁকে সেসব তত্ত্বজ্ঞান শিখিয়েছেন যা মানুষের কাছে গোপন ছিল। তাঁর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের কল্যাণের এক ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছেন। তিনি এসেছেনই পবিত্র কুরআনের আইন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ে এসব তথাকথিত আলেমের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এরপর কতিপয় সস্তা খ্যাতি প্রত্যাশীরাজনীতিবিদ এবং সরকারী কর্মকর্তারাও তাদের সাথে যোগ দেয় এবং আহমদীদেরকে বিভিন্ন অজুহাতে নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। বিগত কিছুদিন থেকে পুনরায় এরা পবিত্র কুরআনের বিকৃতি ও অবমাননার মনগড়া মামলায় আহমদীদেরকে জড়ানোর চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছে। আল্লাহ্ তা’লা তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন আর যেসব আহমদীকে তারা এসব মিথ্যা ও নির্যাতনমূলক অভিযোগে বন্দি করে রেখেছে তাদের দ্রুত মুক্তিরও উপকরণ আল্লাহ্ তা’লা সৃষ্টি করুন।

বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার আলোকেই পবিত্র কুরআনের জ্ঞান ও গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে জানা যায় আর আহমদীয়া জামা’তই সেই জামা’ত যারা পৃথিবীতে এই কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে।

আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীদের এই মান অর্জন করা প্রয়োজন।

জগদ্বাসীকে জানানো প্রয়োজন, আমাদের বিরুদ্ধে যারা কুফরী ফতওয়া দেয় তাদের দেখানো উচিত যে, আহমদীরা কেবল অতীতের কল্পকাহিনীই বর্ণনা করে না বরং আজও জীবন্ত গ্রন্থ এবং জীবন্ত রসূলের অনুসারীদের ওপর আল্লাহ্ তা’লার আশিসরাজি বর্ষণের প্রতি বিশ্বাস রাখে। একথা বিশ্বাস রাখে যে, আজও আল্লাহ্ তা’লা কথা বলেন।

এটি সত্য কথা যে, অধিকাংশ মুসলমান পবিত্র কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু তবুও পবিত্র কুরআনের জ্যোতি ও আশিস এবং এর প্রভাব সর্বদা জীবন্ত এবং সজিব ও সতেজ রয়েছে। অতএব এখন আমি এটি প্রমাণের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। আর আল্লাহ্ তা’লা সর্বদা যথাসময়ে নিজ বান্দাদেরকে স্বীয় সহায়তা ও সমর্থনের জন্য প্রেরণ করে আসছেন, কেননা তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ । অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরা এই যিকর, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এর সুরক্ষাকারী। (সূরা হিজর: ১০)

“আমি পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলছি, কুরআন শরীফের যে কোনো বিষয়ই উপস্থাপন করবেন সেটিই নিজ অবস্থানে একটি নিদর্শন।”

“পবিত্র কুরআনের দৃষ্টি রয়েছে সমগ্র পৃথিবীর সংশোধনের ওপর আর এটি কোনো বিশেষ জাতিকে সম্বোধন করে না। বরং সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে, এটি সমগ্রমানবজাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এবং সকলের সংশোধনই এর উদ্দেশ্য।”

খোদা তা’লা এই জামা’তকে এজন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যেন এটি ইসলামের সত্যতার জীবন্ত সাক্ষী হয় এবং প্রমাণ করে যে, সেসব কল্যাণ ও প্রভাব এ যুগেও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণে প্রকাশিত হয় যা তেরোশ বছর পূর্বে প্রকাশিত হতো।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৭ শে জানুয়ারী, **২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (২৭ সুলাহ ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহহুদ, তা’ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন কল্যাণের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে বলেন, এর (অর্থাৎ কুরআনের) কল্যাণ ও আশিসের ধারা সর্বদা বহমান রয়েছে আর তা সকল যুগে সেভাবেই সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিল।”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৭)

তিনি (আ.) আরো বলেন, এটি সত্য কথা যে, অধিকাংশ মুসলমান পবিত্র কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু তবুও পবিত্র কুরআনের জ্যোতি ও আশিস এবং এর প্রভাব সর্বদা জীবন্ত এবং সজিব ও সতেজ রয়েছে। অতএব এখন আমি এটি প্রমাণের জন্যই প্রেরিত হয়েছি। আর আল্লাহ্ তা’লা সর্বদা যথাসময়ে নিজ বান্দাদেরকে স্বীয় সহায়তা ও সমর্থনের জন্য প্রেরণ করে আসছেন, কেননা তিনি প্রতিশ্রুতি

দিয়েছিলেন যে, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ । অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমরা এই যিকর, অর্থাৎ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর আমরাই এর সুরক্ষাকারী। (সূরা আল হিজর : ১০)

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১১৬-১১৭)

অতএব বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত সেবককে পবিত্র কুরআনের প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন, পবিত্র কুরআনের সুরক্ষার জন্য প্রেরণ করেছেন। তাঁকে সেসব তত্ত্বজ্ঞান শিখিয়েছেন যা মানুষের কাছে গোপন ছিল। তাঁর মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের কল্যাণের এক ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছেন। তিনি এসেছেনই পবিত্র কুরআনের আইন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নামসর্বস্ব আলেমরা তাঁর দাবির শুরু থেকেই তাঁর বিরোধিতাকে নিজেদের লক্ষ্য বানিয়ে রেখেছে এবং কোনো যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানের কথা তারা শুনতে চায় না আর সাধারণ জনগণকেও তারা বিভ্রান্ত করছে। নিজেরা তো জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বঞ্চিত, কিন্তু যাকে খোদা তা'লা এই কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন তাঁর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকে আর একেই তারা পবিত্র কুরআনের সেবা মনে করে।

পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ে এসব তথাকথিত আলেমের উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর এরপর কতিপয় সস্তা খ্যাতি প্রত্যাশী রাজনীতিবিদ এবং সরকারী কর্মকর্তারাও তাদের সাথে যোগ দেয় এবং আহমদীদেরকে বিভিন্ন অজুহাতে নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। বিগত কিছুদিন থেকে পুনরায় এরা পবিত্র কুরআনের বিকৃতি ও অবমাননার মনগড়া মামলায় আহমদীদেরকে জড়ানোর চেষ্টায় উঠেপড়ে লেগেছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন আর যেসব আহমদীকে তারা এসব মিথ্যা ও নির্যাতনমূলক অভিযোগে বন্দি করে রেখেছে তাদের দ্রুত মুক্তিরও উপকরণ আল্লাহ্ তা'লা সৃষ্টি করুন।

যাহোক যেমনটি আমি বলেছি, বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার আলোকেই পবিত্র কুরআনের জ্ঞান ও গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে জানা যায় আর আহমদীয়া জামা'তই সেই জামা'ত যারা পৃথিবীতে এই কাজ সম্পাদন করে যাচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং মান ও মর্যাদা সম্পর্কে নিজের বিভিন্ন বক্তব্য ও লেখনীতে যেসব তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন এবং অবগত করেছেন তা আজ আমি বর্ণনা করব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে পবিত্র কুরআনের পূর্ণ তথা পরিপূর্ণ শিক্ষা হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, পবিত্র কুরআন নিজ শিক্ষায় পরিপূর্ণ আর কোনো সত্যই এর বহির্ভূত নয়। কেননা মহা সম্মানিত আল্লাহ বলেন, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ (সূরা নাহল: ৯০)। অর্থাৎ আমরা তোমার প্রতি সেই গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি যাতে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এরপর তিনি বলেন, مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (সূরা আনআম: ৩৯)। অর্থাৎ আমরা কোনো জিনিসই এই কিতাবের বহির্ভূত রাখি নি। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু একইসাথে আমার এ বিশ্বাসও রয়েছে যে, পবিত্র কুরআন থেকে সমস্ত ধর্মীয় বিষয়াদি চয়ন ও ফলাফল নির্ণয় করা এবং ঐশী ইচ্ছানুসারে এর সংক্ষিপ্ত বিষয়াদির সঠিক ব্যাখ্যা করার সামর্থ্য সকল আলেম ও মৌলবির নেই। অর্থাৎ সবাইকে এই যোগ্যতা দেওয়া হয় নি যে, এর (অর্থাৎ কুরআনের) তফসীর ও ব্যাখ্যা করবে এবং গভীরে গিয়ে এর জ্ঞান ও তত্ত্বের মুক্তো আহরণ করে আনবে। তিনি (আ.) বলেন, বরং এটি বিশেষভাবে তাদের কাজ যাদেরকে নবুয়্যত অথবা মহান বেলায়েত হিসেবে খোদার ওহী দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। সুতরাং এমন ব্যক্তিদের জন্য যারা এলহামপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে পবিত্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান চয়ন ও আবিষ্কারে সমর্থ নয় (তাদের জন্য) সোজা পথ এটিই যে, তারা পবিত্র কুরআনের (তত্ত্বের) চয়ন ও আবিষ্কারের চেষ্টা করার পরিবর্তে সেই সমস্ত শিক্ষাকে কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা ও বিলম্ব না করেই গ্রহণ করে নেয়া যা নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরাগত সুন্নতের মাধ্যমে লাভ হয়েছে।

(অর্থাৎ) এমন অনেক তফসীরকারক আছেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা এই যোগ্যতাই দান করেন নি, সেই জ্ঞানইদেন নি (এবং) তত্ত্বজ্ঞানে সমৃদ্ধই করেন নি– তাদের কাজ হলো, আমাদের পূর্ববর্তী যেসব তফসীরকারক আছেন, বুযুর্গ ব্যক্তি আছেন, যারা তাকওয়ার পথে বিচরণশীল ছিলেন, আমাদের পুরোনো ইমাম যারা নিজ নিজ তফসীর লিখেছেন সেগুলোকে সামনে রাখা, সেগুলোর ওপর আমল করা এবং পবিত্র কুরআনের যতটুকু বাহ্যিক জ্ঞান রয়েছে সেগুলোর ওপর আমল করার চেষ্টা করা, নিজের পক্ষ হতে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করার পরিবর্তে ।

তিনি (আ.) বলেন, আর যারা বেলায়েতের ওহীর মাধ্যমে আলোকিত হয়েছেন এবং ***'ইল্লাল মুতাহহারুন'***–এর শ্রেণিভুক্ত তাদের সাথে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত আচরণ হলো, বিভিন্ন সময় তিনি পবিত্র কুরআনের লুক্কায়িত সূ ক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান তাদের কাছে প্রকাশ করতে থাকেন। যারা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বান্দা হয়ে থাকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের কাছে পবিত্র কুরআনের গভীর জ্ঞান উন্মোচিত করতে থাকেন। এছাড়া তাদের নিকট এ বিষয়টি প্রমাণ করে দেন যে, মহানবী (সা.) কখনোই কোনো অতিরিক্ত শিক্ষা দেন নি। কিছু লোক বলে থাকে, হাদীসে তো এই এই বিষয় বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যখন কুরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান দান করেন তখন তা থেকে এটি জানা যায় যে, মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআনের বাইরে কোনো কথা বলেন নি। তিনি (আ.) বলেন, বরং সহীহ্ হাদীসসমূহে পবিত্র কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিষয়াদি এবং বিভিন্ন ইঙ্গিতের ব্যাখ্যা রয়েছে। সুতরাং এটি পাওয়ার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা তাদের কাছে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ হাদীসসমূহে কতক এমন বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যেগুলোতে কতক আয়াতের ব্যাখ্যা ও বিস্তাতির বিবরণ পাওয়া যায় এবং পবিত্র কুরআনের বিষয়বস্তু তাদের কাছে আরো প্রকাশিত হয়। তিনি (আ.) আরো বলেন, অধিকন্তু এসব সুস্পষ্ট আয়াতের সত্যতা তাদের কাছে প্রকাশিত হয়ে যায়। যেমনটি মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কোনো বিষয়-ই পবিত্র কুরআনের বাইরে নয়।"

(আল-হক মুবাহাসা লুধিয়ানা,রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৮০-৮১)

বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বিতরণের জন্য প্রেরণ করেছেন।

অতঃপর হেদায়েত লাভের প্রথম মাধ্যম হচ্ছে কুরআন– এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমার বিশ্বাস হলো , তিনটি জিনিস তোমাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে দান করেছেন। সর্বপ্রথম হচ্ছে, পবিত্র কুরআন যাতে খোদা তা'লার একত্ববাদ ও প্রতাপ এবং মাহাত্ম্যের উল্লেখ রয়েছে এবং যাতে সেসব মতবিরোধের সমাধান করা হয়েছে যা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মাঝে ছিল, যেমন–এই মতবিরোধ ও ভুলধারণা যে, মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ.)-কে ক্রুশে দিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং তিনি (আ.) অভিশপ্ত হয়েছেন আর অন্যান্য নবীদের ন্যায় তাঁর রাফা তথা আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নি। অর্থাৎ ইহুদিদের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত ঈসা (আ.)-কে স্বীয় নৈকট্যে ধন্য করেন নি। একদিকে এটিকে অস্বীকার করা হয়েছে, অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর যে অভিযোগ রয়েছে তা ভুল। দ্বিতীয়ত বলেন, পবিত্র কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর তোমরা উপাসনা কোরো না, কোনো মানুষেরও না আর কোনো পশুরও না। সূর্যেরও না, চন্দ্রেরও না এবং অন্য কোনো নক্ষত্রেরও না আর উপকরণেরও না এবং নিজ প্রবৃত্তিরও না। সকল প্রকার শিরক থেকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বারণ করেছেন এবং এর নসীহত করেছেন আর খুবই সুস্পষ্টভাবে তা করেছেন। সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা ও কুরআনের হেদায়েতের বিরুদ্ধে এক পা-ও অগ্রসর হয়ো না। আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের ৭০০ নির্দেশের একটি ছোট নির্দেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হাতে নিজের জন্য মুক্তির দ্বার বন্ধ করে। প্রকৃত ও পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন-ই উন্মুক্ত করেছে এবং অবশিষ্ট সবই এর প্রতিচ্ছবি ছিল। অতএব পবিত্র কুরআনকে তোমরা গভীর মনোনিবেশের সাথে পাঠ করো এবং এর সাথে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক রাখো। এরূপ ভালোবাসা যা তোমরা অন্য কারো সাথেই করো নি। তিনি (আ.) বলেন, কেননা যেভাবে খোদা তা'লা আমাকে এলহামের মাধ্যমে সম্বোধন করে বলেছেন, اَلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الْقُرْاٰنِ। অর্থাৎ সকল প্রকার কল্যাণ পবিত্র কুরআনে রয়েছে– এ কথাই সত্য। পরিতাপ সেসব লোকের জন্য যারা অন্য কোনো বস্তুকে এর ওপর প্রাধান্য দেয়। তোমাদের সকল সফলতা ও মুক্তির উৎস কুরআনে নিহিত। তোমাদের এমন কোনো ধর্মীয় প্রয়োজন নেই যা পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায় না। কুরআনই কেয়ামত দিবসে তোমাদের ঈমানের সত্যায়নকারী বা মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হবে। এছাড়া আকাশের নীচে কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থ নেই যা কুরআনের সাহায্য গ্রহণ না করে তোমাদেরকে হেদায়েত দিতে পারে।"

অর্থাৎ ধর্মীয় হেদায়েতের জন্য পবিত্র কুরআনের মাধ্যম অবশ্যই প্রয়োজন। যাঁর শিক্ষা ও ধ্যানধারনা এরূপ, যিনি তার মান্যকারীদের এভাবে নসীহত করেন, তিনি কি পবিত্র কুরআনে কোনো প্রকার পরিবর্তন করতে পারেন? তাদের তো কিছুটা হলেও বিবেকবুদ্ধি খাটানো উচিত।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, খোদা তা'লা তোমাদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন , তিনি তোমাদেরকে কুরআন শরীফের ন্যায় ধর্মগ্রন্থ দান করেছেন। আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, সেই ধর্মগ্রন্থ যা তোমাদের নিকট পাঠ করা হয়েছে তা যদি খ্রিষ্টানদের কাছে পাঠ করা হতো তবে তারা ধ্বংস হতো না। এই যে হেদায়েত ও নেয়ামত তোমাদেরকে দান করা হয়েছে তা যদি ইহুদিদেরকে তওরাতের পরিবর্তে দেওয়া হতো তাহলে তাদের কোনো কোনো ফির্কা কিয়ামতের অস্বীকারকারী হতো না। সুতরাং তোমরা এই নেয়ামতের মূল্য দাও যা তোমাদেরকে দান করা হয়েছে। এটি একটি অতি প্রিয় নেয়ামত। এটি একটি মহা সম্পদ। কুরআন অবতীর্ণ না হলে পুরো পৃথিবী এক অপবিত্র মাংসপিণ্ডের ন্যায় ছিল, অর্থাৎ এক জমাট রক্তপিণ্ডের ন্যায় ছিল। কুরআন হলো সেই গ্রন্থ যার বিপরীতে অন্য সব হেদায়েত তুচ্ছ। ইঞ্জিল আনয়নকারী ছিল সেই রূহুল কুদুস যা কবুতরের

আকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল, যা এক দুর্বল ও শক্তিহীন পাখি। বলা হয়ে থাকে, হযরত জিব্রাঈল কবুতররূপে হযরত ঈসা (আ.)-এর কাছে এসেছিলেন। তিনি (আ.) বলেন, এটি তো এক দুর্বল পাখি যাকে বিড়ালও ধরতে পারে। এ কারণেই খ্রিষ্টানরা দিন দিন দুর্বলতার গহ্বরে নিপতিত হয়েছে এবং আধ্যাত্মিকতা তাদের মাঝে অবশিষ্ট থাকে নি। আর বর্তমান অবস্থা হলো, যেসব পরিসংখ্যান সামনে আসছে যে, খ্রিষ্টানদের অধিকাংশই খ্রিষ্টধর্মকে অস্বীকার করছে এবং খ্রিষ্টধর্ম পরিত্যাগ করছে। এরকারণ হলো, সেখানে তারা আধ্যাত্মিকতা পাচ্ছে না। অথচ মুসলমানদের দুর্ভাগ্য হলো, পবিত্র কুরআন থাকা সত্ত্বেও এর ওপর আমল না করার ফলে এর আধ্যাত্মিকতা হতে তারা উপকৃত হতে পারছে না আর যে মহাপুরুষকে এই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রচার ও প্রসারের জন্য আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন তাকে মানতে তারা অস্বীকার করছে। তিনি (আ.) বলেন, কেননা তাদের ঈমানের পুরো ভিত্তি কবুতরের ওপর ছিল। কিন্তু কুরআনের রূহুল কুদুস সেই মহান আকৃতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যিনি ভূমি থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত পুরো জগৎকে নিজ সত্তায় পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। অতএব কোথায় সেই কবুতর আর কোথায় এই মহান জ্যোতির্বিকাশ যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনেও বিদ্যমান! কুরআন এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করতে সক্ষম।"

যদি এর নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করা হয় তবে তা এক সপ্তাহের মাঝে মানুষকে পবিত্র করতে সক্ষম। "যদি বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ কোনো অন্তরায় না থাকে তবে কুরআন তোমাদেরকে নবীদের সদৃশ করে দিতে পারে, যদি তোমরা নিজেরা এর থেকে দূরে সরে না যাও।" অর্থাৎ যদি পরিপূর্ণ রূপে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা পালন করা হয় এবং এর প্রতিটি নির্দেশ অনুসরণ করা হয় তাহলে মানুষ নবীদের রঙে রঙিন হতে পারে। এটি এক চূড়ান্ত মোকাম বা পর্যাদা , পবিত্র কুরআনের কল্যাণে যার দ্বারা মানুষ আশিসমণ্ডিত হতে পারে।

তিনি (আ.) বলেন, কুরআন ব্যতিরেকে অন্য কোন্ গ্রন্থ নিজের পাঠককে একদম সূচনাতেই এই দোয়া শিখিয়েছে এবং এই আশ্বাস দিয়েছে যে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ আমাদেরকে তোমার সেসব নিয়ামত বা পুরস্কারের পথ দেখাও যা পূর্ববর্তীদেরকে দেখানো হয়েছে, যাঁরা নবী, রসূল, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ্ ছিলেন। তিনি (আ.) বলেন, অতএব নিজেদের মনোবল বৃদ্ধি করো এবং কুরআনের আহ্বানকে অগ্রাহ্য কোরো না, কারণ এটি তোমাদেরকে সেসব পুরস্কার প্রদান করতে চায় যা পূর্ববর্তীদেরকে দেওয়া হয়েছিল।"

(কিশতিয়ে নূহ,রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২৬-২৭)

তিনি (আ.) বলেন, এমনিভাবে কুরআনের পর হেদায়েত লাভের দ্বিতীয় মাধ্যম হলো, মহানবী (সা.)-এর সুন্নত এবং তৃতীয় মাধ্যম হলো হাদীস, কেননা তা দীর্ঘকাল পরে এসেছে, অনেক বছর পর, বরং শত বছরের চেয়েও অধিক সময় পরে এসেছে। তবে শর্ত হলো এসব হাদীস যেন কুরআন ও সুন্নত পরিপন্থি না হয়।

পবিত্র কুরআনকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, যারা কুরআনকে সম্মান দিবে তারা ঊর্ধ্বলোকে সম্মান লাভ করবে।

এর বিস্তারিত বিবরণে তিনি (আ.) বলেন, তোমাদের জন্য এক অপরিহার্য শিক্ষা হলো, পবিত্র কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুর মতো ফেলে রেখো না। এতেই তোমাদের জীবন নিহিত। যারা কুরআনকে সম্মান করবে তারা ঊর্ধ্বলোকে সম্মান লাভ করবে।"

পবিত্র কুরআন থেকে একেবারেই মুখ ফিরিয়ে নিও না। এমন যেন না হয় যে, এর ওপর একেবারেই আমল করবে না। এটি পাঠ করো, নিয়মিত পাঠ করো। এর উপদেশমালা মেনে চলো, কারণ যারা কুরআনকে সম্মান প্রদান করবে তারা ঊর্ধ্বলোকে সম্মান লাভ করবে।] যারা প্রত্যেক হাদীস ও প্রত্যেক বাণীর ওপর কুরআনকে অগ্রাধিকার প্রদান করবে তাদেরকে ঊর্ধ্বলোকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। মানবজাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই এবং সকল আদমসন্তানের জন্য এখন মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ব্যতীত কোনো রসূল ও শাফী বা যোজক নেই। কাজেই তোমরা সেই মহা সম্মান ও প্রতাপের অধিকারী নবীর সাথে সত্যিকার প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হতে চেষ্টা করো এবং অন্য কাউকে তাঁর ওপর কোনো প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান কোরো না যেন ঊর্ধ্বলোকে তোমরা মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হও। আর স্মরণ রেখো! মুক্তি সেই জিনিসের নাম নয় যা মৃত্যুর পর প্রকাশিত হবে, বরং প্রকৃত মুক্তি সেটি যা এই পৃথিবীতেই স্বীয় জ্যোতির বিকাশ ঘটায়।"

ঈমান এত দৃঢ় হয় যে, এই পৃথিবীতেই মানুষের মাঝে তার জ্যোতি বিকশিত হয়; সকল প্রকার আঁধার বা অমানিশাকে মোকাবিলা করার জন্য মানুষ প্রস্তুত হয়ে যায়, যার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা সম্প্রতি আমাদের বুর্কিনা ফাসোর শহীদ ভাইদের মাঝে দেখতে পাই।

তিনি (আ.) বলেন, "মুক্তিপ্রাপ্ত কে? সেই ব্যক্তি যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, খোদা সত্য আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর এবং সকল সৃষ্টজীবের মধ্যবর্তী শাফী বা যোজক এবং আকাশের নীচে তাঁর সমমর্যাদার কোনো রসূল নেই আর কুরআনের সমমর্যাদার কোনো গ্রন্থ ও নেই। অন্য কারো বিষয়ে খোদা এটি চান নি যে, তিনি চিরকাল জীবিত থাকুন; কিন্তু এই মনোনীত নবী চিরকালের জন্য জীবিত।"

(কিশতিয়ে নূহ,রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ১৩-১৪)

আরো একটি আরোপিত অপবাদ খণ্ডন করে দিয়েছেন। অর্থাৎ নাউযুবিল্লাহ্, আমরা নাকি মহানবী (সা.)-এর অবমাননা বা অসম্মান করি!

এরপর পবিত্র কুরআনের খাতামুল কুতুব হওয়া সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) খাতামুন্নাবীঈন বা নবীদের মোহর এবং পবিত্র কুরআন খাতামুল কুতুব বা সর্ব শ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ । এখন আর কোনো কলেমা কিংবা আর কোনো নামায হতে পারে না। যা কিছু মহানবী (সা.) বলেছেন অথবা করে দেখিয়েছেন এবং যা কিছু পবিত্র কুরআনে রয়েছে তা ব্যতীত মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। যে এগুলো পরিত্যাগ করবে সে জাহান্নামে যাবে। এটি আমাদের মতাদর্শ এবং বিশ্বাস। কিন্তু এর পাশাপাশি একথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই উম্মতের জন্য ঐশী বাক্যালাপ ও কথোপকথনের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। [আল্লাহ্ তা'লা কথা বলেন এবং সম্বোধন করেন; এই পথ উন্মুক্ত রয়েছে। এই দ্বার রুদ্ধ হয় নি। আর এই দ্বার পবিত্র কুরআনের সত্যতা এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতার স্বপক্ষে চিরন্তন সাক্ষী আর এজন্য আল্লাহ্ তা'লা সূরা ফাতিহাতেই এই দোয়া শিখিয়েছেন যে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ । তিনি (আ.) বলেন, ***'আনআমতা আলাইহিম'*** - এর পথ পাওয়ার জন্য যে দোয়া শিখিয়েছেন তাতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদের উৎকর্ষ বা পরাকাষ্ঠা লাভের (প্রতি) ইঙ্গিত রয়েছে। এছাড়া এটি জানা কথা যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামকে যে পরাকাষ্ঠা দান করা হয়েছে তা ঐশী তত্ত্বজ্ঞানেরই উৎকর্ষ ছিল আর এই পুরস্কার তাঁরা ঐশী বাক্যালাপ ও কথোপকথনের মাধ্যমেই লাভ করেছেন। তোমরাও সেগুলোর আকাঙ্ক্ষী হও। অতএব এই নিয়ামত সম্পর্কে কিছুটা প্রণিধান করো যে, পবিত্র কুরআন এই দোয়া করার নির্দেশ দেয় ঠিকই কিন্তু এর কোনো ফলই হয় না অথবা এই উম্মতের কোনো ব্যক্তিই এই সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না। " একদিকে এই দোয়া করো। আল্লাহ্ তা'লা তো বলেন, তোমরা সবাই দোয়া করো আর যে এই মানে উপনীত সে এই মর্যাদা লাভ করতে পারবে। কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, "মুসলমানদের অবস্থা বড়ই অদ্ভুত। আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া শিখিয়েছেন কিন্তু পুনরায় একথা বলেছেন যে,অনেক মানুষ লাভ করবে তো দূরের কথা একজনও লাভ করবে না। এই উম্মতে এমন একজনও নেই যে এই মর্যাদা লাভ করতে পারে।" তিনি (আ.) বলেন, এসব মানুষের দৃষ্টিতে কিয়ামত পর্যন্ত এই দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন বলো, এর ফলে ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর অসম্মান প্রমাণিত হবে নাকি কোনো শ্রেষ্ঠত্ব সাব্যস্ত হবে? [আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে থাক, কিন্তু এখন তোমরাই বলো, তোমরা যে দ্বার বন্ধ করছো আর আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এই দোয়া শিখিয়েছেন তা সত্ত্বেও তোমরা এই দ্বার রুদ্ধ করছো তাহলে প্রকৃতপক্ষে কারা এই অবমাননার জন্য দায়ী হচ্ছে? তোমরা নাকি আমরা?] তিনি (আ.) বলেন, আমি সত্য সত্য বলছি, যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করে সে ইসলামের দুর্নাম করছে আর সে শরীয়তের মর্মই বুঝে নি। ইসলামের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্নিহিত বিষয়টি হলো, মানুষ কেবল মৌখিকভাবেই যেন আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের ঘোষণা না দেয়, বরং প্রকৃতপক্ষে তা অনুধাবন করবে এবং বেহেশ্ত ও দোযখের প্রতি যেন কাল্পনিক বিশ্বাস না রাখে বরং প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীতেই সে জান্নাতী অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবে। [এমন পুণ্য করবে যাতে ইহজীবনও জান্নাতপ্রতীম হয়ে যাবে] আর যেসব পাপাচারে পশুতুল্য মানুষ নিপতিত সেগুলো (থেকে) পরিত্রাণ লাভ করবে। তিনি (আ.) বলেন, এগুলো ইসলামের সুমহান উদ্দেশ্য ছিল এবং আছে আর এটি এমন পূতঃপবিত্র উদ্দেশ্য যে, অন্য কোনো জাতি তাদের ধর্মে এর দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে না আর না-ই এরূপ আদর্শ দেখাতে পারবে। চাইলে তো যে কেউ বলতে পারে, কিন্তু কে আছে যে দেখাতে পারে? "

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৮৫-২৮৬)

অতএব, আজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারীদের এই মান অর্জন করা প্রয়োজন।

জগদ্বাসীকে জানানো প্রয়োজন, আমাদের বিরুদ্ধে যারা কুফরী ফতওয়া দেয় তাদের দেখানো উচিত যে, আহমদীরা কেবল অতীতের কল্পকাহিনীই বর্ণনা করে না বরং আজও জীবন্ত গ্রন্থ এবং জীবন্ত রসূলের অনুসারীদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার আশিসরাজি বর্ষণের প্রতি বিশ্বাস রাখে। একথা বিশ্বাস রাখে যে, আজও আল্লাহ্ তা'লা কথা বলেন।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা সেই নবী দিয়েছেন যিনি খাতামুল মু'মিনীন, খাতামুল আরেফীন এবং খাতামুন্নাবীঈন। এভাবেই তাঁর প্রতি তিনি সেই গ্রন্থ অবতীর্ণকরেছেন যা সকল (ঐশী) গ্রন্থের

সমষ্টি এবং খাতামুল কুতুব। মহানবী (সা.), যিনি খাতামান্নাবীঈন আর তাঁর (সা.)-এর মাধ্যমে নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে। এই নবুয়্যত এভাবে সমাপ্ত হয় নি যেভাবে কেউ গলা টিপে কাউকে মেরে ফেলে। এমন সমাপ্তি গর্বের বিষয় হয় না বরং মহানবী (সা.)-এর সত্তায় নবুয়্যত শেষ হওয়ার অর্থ হলো, প্রকৃতিগতভাবেই তাঁর মাধ্যমে নবুয়্যতের উৎকর্ষের সমাপ্তি ঘটেছে। অর্থাৎ সেসব বিভিন্ন উৎকর্ষ যা আদম (আ.) থেকে আরম্ভ করে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম পর্যন্ত সকল নবীকে প্রদান করা হয়েছিল, কাউকে কোনোটি আবার কাউকে (অন্য) কোনোটি, সেগুলোর সবই মহানবী (সা.)-এর সত্তায় একত্রিত করা হয়েছে আর এর ফলে প্র কৃতিগতভাবেই তিনি (সা.) খাতামান্নাবীঈন সাব্যস্ত হয়েছেন। এছাড়া এভাবেই সেসব শিক্ষামালার সমষ্টি, উপদেশালী ও তত্ত্বজ্ঞান যা বিভিন্ন গ্রন্থতে ধারাবাহিকভাবে এসেছে আর সেই ধারার সমাপ্তি পবিত্র কুরআনে হয়েছে এবং (এভাবেই) পবিত্র কুরআন খাতামুল কুতুব বা সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশীগ্রন্থ সাব্যস্ত হয়েছে। ”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪১-৩৪২)

এরপর তিনি (আ.) বলেন, খাতামান্নাবীঈন শব্দটি যে মহানবী (সা.)-এর জন্য বলা হয়েছে তা স্বয়ং এই দাবি করে আর এই শব্দের মাঝে স্বভাবতই এটি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে, সেই গ্রন্থ যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে সেটিও খাতামুল কুতুব হবে এবং সকল উৎকর্ষ তাতে বিদ্যমান থাকবে আর বাস্তবেই সেই উৎকর্ষ তাতে বিদ্যমান।

কেননা ঐশী বাণী অবতরণের সাধারণ রীতি ও পদ্ধতি হলো, যার প্রতি ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয় সেই ব্যক্তির মাঝে যতবেশি পবিত্রকরণ শক্তি ও আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ বিদ্যমান থাকে ততবেশি শক্তি ও প্রভাব সেই বাণীর হয়ে থাকে। মহানবী (সা.)-এর পবিত্রকরণ শক্তি ও আভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ যেহেতু উচ্চ থেকে উচ্চ পর্যায়ের ছিল যার চেয়ে বেশি (উৎকর্ষ) না কখনো কোনো মানুষের (লাভ) হয়েছে আর না ভবিষ্যতে হবে। [এমন উচ্চ পর্যায়ের উৎকর্ষ যা না কখনো (লাভ) হয়েছে আর না ভবিষ্যতে কখনো হবে। অথচ আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -কে তাঁর (সা.)-এর চেয়ে বড় মনে করে থাকি, নাঊযুবিল্লাহ্। আর আমরা রসূল অবমাননার অপরাধে অপরাধী। এসব বাক্য থাকার পর কোনো বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ মানুষ একথা বলতে পারবে না যে, আহমদীরা কোনোভাবে রসূল অবমাননার অপরাধে অপরাধী।] তিনি (আ.) বলেন, এ জন্যই পবিত্র কুরআনও পূর্ববতী সকল ঐশীগ্রন্থ ও পুস্তকের চেয়ে এমন উচ্চস্তর ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত যে পর্যন্ত অন্য কোনো বাণী পৌঁছে নি। কেননা মহানবী (সা.)-এর যোগ্যতা এবং পবিত্রকরণ শক্তি সবার চেয়ে বেশি ছিল এবং উৎকর্ষের সকল পর্যায় তাঁর সত্তায় সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল আর তিনি (সা.) পরম শিখরে উপনীত ছিলেন। এই অবস্থায় তাঁর (সা.) প্রতি যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে (তাও) পরম মার্গে উপনীত। এছাড়া নবুয়্যতের উৎকর্ষ যেভাবে তাঁর (সা.) সত্তায় সমাপ্ত হয়েছে একইভাবে (ঐশী) বাণীর অলৌকিকতার পরাকাষ্ঠাও পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। তিনি (সা.) খাতামান্নাবীঈন সাব্যস্ত হয়েছেন এবং তাঁর (সা.) গ্রন্থ খাতামুল কুতুব গণ্য হয়েছে।”

তিনি (আ.) বলেন, বাচনশৈলীর যত স্তর ও কারণ থাকতে পারে সেই সবগুলোর নিরিখে তাঁর (সা.) গ্রন্থ পরম মার্গে উপনীত। [কোনো বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষের যত স্তর বা কারণ থাকা সম্ভব তার সবই এতে বিদ্যমান রয়েছে।

“ অর্থাৎ বাগ্মীতা ও প্রাঞ্জলতার নিরিখেই হোক বা বিষয়বস্তুর বিন্যাসের দিক দিয়ে অথবা শিক্ষামালার নিরিখে হোক বা শিক্ষার উৎকর্ষ ও শিক্ষার ফলপ্রসূতার দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক না কেন। মোটকথা যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন সে দিক থেকেই পবিত্র কুরআনের উৎকর্ষ দৃষ্টিগোচর হয় এবং এরই অলৌকিকতা সাব্যস্ত হয়। এ কারণেই পবিত্র কুরআন কোনো বিশেষ বিষয়ের দৃষ্টান্ত চায় নি বরং সাধারণভাবে দৃষ্টান্ত আহ্বান করেছে। অর্থাৎ যে দৃষ্টিকোণ থেকেই চাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো, তা সে বাগ্মীতা ও প্রাঞ্জলতার দিক থেকেই হোক না কেন। কোনো বিশেষ দিকে আহ্বান করে নি। যে কোনো ভাবেই আসো, পবিত্র কুরআনের সাথে মোকাবিলা করে দেখো। পবিত্র কুরআনে সব ধরণের বিষয়বস্তু বিদ্যমান রয়েছে।] তা বাগ্মীতা ও প্রাঞ্জলতার দিক থেকেই হোক, অর্থ ও উদ্দেশ্যাবলীর দিক থেকেই হোক অথবা শিক্ষামালার দিক থেকেই হোক কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী এবং অদৃশ্যের (সংবাদের) দিক থেকেই হোক না কেন। [পবিত্র কুরআনে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী ও অদৃশ্যের (সংবাদ) বিদ্যমান রয়েছে।] মোটকথা যেদিক দিয়েই দেখো না কেন এটি (একটি) অলৌকিক নিদর্শন।”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬-৩৭)

অতঃপর এক বৈঠকে তিনি (আ.) বলেন, একথা কিছুতেই ভুলে যাওয়ার মতো নয় যে, পবিত্র কুরআন খাতামুল কুতুব বা সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ তা মূলত কল্পকাহিনীর সমাহার নয়। যারা তাদের ভুল ধারণা ও সত্য গোপন করার বশবর্তী হয়ে পবিত্র কুরআনকে গল্পের ডালি আখ্যা দিয়েছে তারা প্রকৃত সত্য সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য থেকে অংশ লাভ করে নি। অন্যথায় এই পবিত্র গ্রন্থ তো পূ র্বের বিভিন্ন কাহিনীকেও এক দর্শন বানিয়ে দিয়েছে। [(কুরআন) যেসব ঘটনা বর্ণনা করেছে তাও এমনভাবে বর্ণ না করেছে যেনসেটিও একটি দর্শন, তাতে একটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে এবং একটি গভীরতা বিদ্যমান।] তিনি (আ.)বলেন, আর সকল (ঐশী) কিতাব এবং নবীদের প্রতি এটি তাঁর মহান অনুগ্রহ যে, সেসব কাহিনীকেও তিনি দর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন অন্যথায় আজ এসব বিষয় নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রুপ করা হতো আর এটিও আল্লাহ্ তা’লার এক বিশেষ কৃপা যে, এই জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগে যখন মহাবিশ্বে র প্রকৃত তত্ত্ব এবং সকল পদার্থের বৈশিষ্টের জ্ঞান উন্নতি লাভ করছে তখন তিনি ঐশী জ্ঞান এবং সত্যের উন্মোচনের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বিরাট বিরাট জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানের বিষয় রয়েছে, অন্যান্য বিষয়ও আছে, জগৎ উন্নতি করে চলেছে, অধিকতর গবেষণা চলছে, এর জন্য ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন আর সেই ব্যবস্থাপনায় কুরআনের এই জ্ঞান থেকে জ্ঞান আহরণ করে, এই শিক্ষা থেকে জ্ঞান আহরণ করার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেসব কিছু বর্ণ না করেছেন যে, কীভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মে র মধ্যে ঐকতান আছে। তিনি (আ.) বলেন, যে এসব ঘটনাকে ‘ফেয়জে আওজ’এর যুগে এক সাধারণ কল্পকাহিনীর উর্ধ্বে গুরুত্ব ই দিত না আর এই বিজ্ঞানের যুগে এগুলো নিয়ে হাসিতামাশা চলছিল।” যে অন্ধকার যুগ ছিল, এক অজ্ঞতার যুগ ছিল, ইসলামে গুটিকতক আলেম দৃষ্টিগোচর হতো সে যুগের এই কথাগুলো ছড়িছে]। লোকেরা হাসাহাসি করত, বিজ্ঞানীরা হাসাহাসি করত যে, এগুলো কী? কিন্তু তাঁকে প্রেরণ করে আর তিনি পবিত্র কুরআনের যে তফসীর ও ব্যাখ্যা করেছেন আর যেভাবে এর তত্ত্বকথা বর্ণনা করেছেন তিনি (আ.) বলেন, জ্ঞানের দিক থেকে একে দর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৩)

মুসলমানদের আল্লাহ্ তা’লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। কেননা তিনি এ যুগে নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা উপস্থাপনের জন্য নিজ প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষকে পাঠিয়েছেন যিনি ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে যেসব অজ্ঞতার অভিযোগ ছিল সেগুলো দূর করে দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনের ওপর ঈমান এবং এর আনুগত্যকে তিনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন আর একে ঈমানের অংশ বলে জ্ঞান করতেন। এবিষয়টি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর আনুগত্য থেকে সামান্য এদিক সেদিক হওয়াও বে-ঈমানী মনে করি। আমার বিশ্বাস হলো, যে এর সামান্য (অংশও) পরিত্যাগ করবে সে জাহান্নামী। তিনি (আ.) বলেন, এছাড়া এ বিশ্বাসকে কেবল বিভিন্ন বক্তৃতায়ই নয় বরং আমার ষাটের অধিক রচনায় আমি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি আর অহরাত্রি আমার কেবল এ চিন্তাই থাকে।

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৫৯)

তিনি (আ.) বলেন, আমাদের বিরোধীরা চট করেই আমাদের ওপর কুফরী ফতোয়া দিয়ে দেয়, আমাদের পক্ষ থেকে তারা যদি কোনো কথা শুনেই থাকে তাহলে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে ন্যায়ের দাবি ছিল, আমাদের কাছে তারা জিজ্ঞেস করতে পারত যে, আপনি কি এমন কথা বলেছ, নাকি বল নি? আর বলে থাকলে এটি তো ইসলামসম্মত নয়, এটি বুঝিয়ে দিন, কিন্তু না (এমনটি করবে না)। তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু তারা আদৌ ভ্রুক্ষেপ করে না। তারা কেবল কুফুরি ফতোয়া দিতে উতলা হয়ে আছে।

(লেকচার লুধিয়ানা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২৫৯)

অতএব আমরা যা বর্ণনা করেছি তা ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের আলোকে বর্ণনা করেছি এবং আমাদের বিশ্বাস এটিই আর এ অনুসারেই আমরা আমল করি।

পবিত্র কুরআন এবং প্রাকৃতিক নিয়মের সামঞ্জস্যের বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র এবং পরিপূর্ণ শিক্ষা হলো কুরআনের শিক্ষা যা মানব রূপী বৃক্ষের প্রতিটি শাখার লালনপালন করে আর পবিত্র কুরআন কেবল এক দিকেই গুরুত্বারোপ করে না বরং কখনো ক্ষমা ও মার্জনার শিক্ষা দেয় কিন্তু শর্ত হলো, ক্ষমা যেন সংশোধনের উদ্দেশ্যে করা হয় আর কখনো স্থানকালভেদে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার কথা বলে। কখনো ক্ষমা করার শিক্ষা দেয় এবং কখনো শাস্তি দেয়ার শিক্ষা দেয়। কাজেই বস্তত পবিত্র কুরআন খোদা তা’লার এই প্রকৃতির বিধানের বাস্তব প্রতিবিম্ব যা সদা আমাদের সামনেই রয়েছে। এটি নিতান্তই যৌক্তিক বিষয়টি যে, খোদা তা’লার কথা ও কাজে মিল থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ যেভাবে পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা’লার কর্ম পরিলক্ষিত হয় সেভাবে তাঁর সত্য কিতাবের জন্যও আবশ্যক তাঁর কর্ম অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মে আমরা দেখতে পাই, আল্লাহ্ কোথাও ক্ষমা করেন আবার কোথাও শাস্তি প্রদান করেন আবার কখনো ছাড় দেন। অতএব ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও সেই একই নীতি হওয়া উচিত এবং ধর্ম গ্রন্থেও হওয়া

উচিত আর তা কুরআন শরীফে আছে।] তিনি (আ.) বলেন, এমন নয় যে, কার্যত কিছু প্রকাশ পাবে আর কথায় অন্য কিছু প্রকাশ পাবে। খোদা তা'লার কার্যক্রমে আমরা দেখতে পাই, সর্বদাই নম্রতা ও ক্ষমা থাকে না বরং অপরাধীদের তিনি বিভিন্ন ধরনের কষ্টের মাধ্যমে শাস্তিও দিয়ে থাকেন। এমন শাস্তির কথা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও উল্লেখ আছে। আমাদের খোদা কেবল পরম সহিষ্ণুইনয় বরং পরম প্রজ্ঞার অধিকারীও বটে আর তাঁর শস্তি ও ভয়ঙ্কর। সত্য ধর্ম গ্রন্থ সেটি যা তাঁর প্রকৃতির নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সত্য ঐশীবাণী সেটি যা তাঁর কর্মের বিরোধী নয়। আমরা কখনো এমনটি দেখি নি যে, খোদা তা'লা স্বীয় সৃষ্টির প্রতি সর্বদা সহনশীল ও ক্ষমার আচরণ করেছেন এবং কোনো শাস্তি দেন নি। এখনো অপবিত্র স্বভাবের লোকদের জন্য আমার মাধ্যমে খোদা তা'লা একটি বিরাট ও ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন যা তাদেরকে ধ্বংস করবে।"

(চাশমায়ে মসীহি, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২০, পৃ: ৩৪৬-৩৪৭)

এটি সে-সময়ের কথা যখন তিনি ভূমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীতে একমাত্র কুরআন-ই রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লার সত্তা ও গুণাবলীকে তাঁর প্রকৃতির বিধান অনুযায়ী প্রকাশ করেছে যা খোদার কর্মের মাধ্যমে পৃথিবীতে পরিদৃষ্ট হয় এবং যা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিতে অঙ্কিত আছে।

খ্রিষ্টান সাহেবদের খোদা কেবল ইঞ্জিলের পাতাতেই সীমাবদ্ধ এবং যার কাছে ইঞ্জিল পৌঁছায় নি সে সেই খোদা সম্পর্কে অনবহিত কিন্তু কুরআন যে খোদাকে উপস্থাপন করে তাঁর বিষয়ে কোনো বুদ্ধিমান মানুষ অনবহিত নয়। এজন্য প্রকৃত খোদা তিনিই যাঁকে কুরআন উপস্থাপন করে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসবাসকারী, যে কোনো ধর্মের মান্যকারী এবং নাস্তিকেরাও পৃথিবীর সৃষ্টি দেখলে সামান্য হলেও এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। এছাড়া অধিকাংশ মানুষ তো নিজ নিজ গোত্রীয় ধর্ম অনুযায়ী বিশ্বাস পোষণ করে। যাহোক, তিনি (আ.) বলেন,পবিত্র কুরআনের খোদা তো এমন খোদা যিনি নিজেই নিজেকে প্রকাশ করেন, যার সাক্ষ্য মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির নিয়ম প্রদান করছে, খ্রিষ্টানদের মতো নয়। (চাশমায়ে মসীহি, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২০, পৃ: ৩৫০)

তিনি (আ.) বলেন, সত্যধর্ম সেটিই যা এ যুগেও খোদা তা'লার শোনা ও বলা উভয়টি প্রমাণ করে। সর্বোপরি সত্যধর্মে খোদা তা'লা নিজ বাক্যালাপ ও কথোপকথনের মাধ্যমে নিজেই নিজ সত্তার জানান দেন। খোদাকে চিনতে পারা বড়ই একটি কঠিন কাজ। খোদার খোঁজ করা জাগতিক পণ্ডিত কিংবা দার্শনিকদের কাজ নয়, কেননা আকাশ ও পৃথিবী দেখে কেবল এটি প্রমাণিত হয় যে, এই সুদৃঢ় ও পরিপূর্ণ বিন্যাসের কোনো সৃষ্টিকর্তা হওয়া উচিত, কিন্তু এটি প্রমাণিত হয় না যে, বাস্তবেই সেই সৃষ্টিকর্তা বিদ্যমানও বটে। আর 'থাকা উচিত' এবং 'আছে'-এর মধ্যে যে পার্থক্য তা অতি স্পষ্ট। অতএব সেই সত্তা সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে অবগতকারী একমাত্র পবিত্র কুরআন, যা কেবল খোদাকে শনাক্ত করার ব্যাপারেই জোর দেয় না বরং নিজেই দেখিয়ে দেয়। আকাশের নীচে এমন আর কোনো কিতাব নেই যা এই গোপন সত্তার পরিচয় প্রদানে সক্ষম। "

(চাশমায়ে মসীহি, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২০, পৃ: ৩৫২)

আল্লাহ্ তা'লার সত্তা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে প্রমাণ বিদ্যমান।

ইঞ্জিল এবং অন্যান্য ধর্মীয় কিতাবের বিপরীতে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন একটি পরিপূর্ণ ও জীবন্ত নিদর্শন। কালাম বা ভাষার নিদর্শন এমন নিদর্শন যা কখনো এবং কোনো যুগেই পুরোনো হয় না আর ধ্বংসের হাতও একে স্পর্শ করতে পারে না। হযরত মূসা (আ.)-এর নিদর্শনগুলোর চিহ্ন যদি এ যুগে কেউ দেখতে চায় তাহলে তা কোথায়? ইহুদিদের কাছে কি সেই লাঠি আছে আর এতে কি সাপ হওয়ার মতো কোনো শক্তি এখনো অবশিষ্ট রয়েছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। মোটকথা সকল নবীর মাধ্যমে যেসব নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে তাঁদের সাথেই সেসব নিদর্শনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু আমাদের নবী (সা.)-এর নিদর্শনগুলো এমন যা প্রত্যেক যুগে এবং সব সময় সতেজ ও জীবন্ত বিদ্যমান। এসব নিদর্শনের জীবিত থাকা এবং সেগুলোর ওপর মৃত্যুর হাত প্রসারিত না হওয়া এ বিষয়ের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে যে, মহানবী (সা.)-ই একমাত্র জীবিত নবী এবং প্রকৃত জীবন এটিই যা তাঁকে দান করা হয়েছে আর অন্য পায় নি। তাঁর শিক্ষা সজীব শিক্ষা হওয়ার কারণ হলো, এর ফল ফলাদি এবং কল্যাণরাজি এখনো সেভাবেই বিদ্যমান যা আজ থেকে তেরোশ বছর পূর্বে বিদ্যমান ছিল। বর্তমানে আমাদের সামনে এমন অন্য কোনো শিক্ষা নেই যার অনুসারী এ দাবি করতেপারে যে, এর ফল ফলাদি, আশিস ও কল্যাণরাজি থেকে আমাকে (অংশ) দেওয়া হয়েছে। ফলে আমি আল্লাহ্‌র একটি নিদর্শনে পরিণত হয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপায় আমরা কুরআন শরীফের ফল ফলাদি ও কল্যাণরাজির দৃষ্টান্ত এখনো বিদ্যমান দেখতে পাই। এছাড়া সেসব প্রভাব ও কল্যাণ যা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার অনুসরণে লাভ হয় তা এখনো পেয়ে থাকি।

অতএব খোদা তা'লা এই জামা'তকে এজন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যেন এটি ইসলামের সত্যতার জীবন্ত সাক্ষী হয় এবং প্রমাণ করে যে, সেসব কল্যাণ ও প্রভাব এ যুগেও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণে প্রকাশিত হয় যা তেরোশ বছর পূর্বে প্রকাশিত হতো।

যেভাবে শত শত নির্দশন এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে এসব নিদর্শন প্রকাশও করেছেন, লিখে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া জামা'তের (ইতিহাসের) প্রতিটি দিনই এ বিষয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনি (আ.) যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা কতটা মহিমার সাথে পূর্ণ হচ্ছে!

যাহোক হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক ধর্মের নেতাদের আমি আহ্বান করেছি যেন তারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসে নিজেদের সত্যতার নির্দশন দেখায়। কিন্তু একজনও এমন নেই যে নিজ ধর্মের সত্যতার কোনো দৃষ্টান্ত কার্যত দেখিয়েছে।

আমি খোদা তা'লার কালাম (কুরআন)কে পরিপূর্ণ নিদর্শন বলে বিশ্বাস করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও দাবি হলো এর বিপরীতে অন্য কোনো কিতাব নেই।

আমি পরিপূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলছি, কুরআন শরীফের যে কোনো বিষয়ই উপস্থাপন করবেন সেটিই নিজ অবস্থানে একটি নিদর্শন। উদাহরণস্ব রূপ, শিক্ষাকেই দেখে নিন। সেটিও একটি মহান নিদর্শন হিসেবে দৃষ্টিগোচর হয় আর সত্যিকার অর্থেই নিদর্শন। এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতিগত চাহিদা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত যে, অন্য কোনো শিক্ষা কোনোক্রমেই এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। কুরআন শরীফের শিক্ষা পূর্ববর্তী সকল শিক্ষার পরিপূরক এবং পরিপূর্ণকারী। এখন আমি শুধু শিক্ষার একটি দিক তুলে ধরে প্রমাণ করব যে, কুরআন শরীফের শিক্ষা উন্নত মানের শিক্ষা এবং নিদর্শন। উদাহরণস্বরূপ তওরাতের শিক্ষা। তিনি বলেন, সমসমায়িক পরিস্থিতি সাপেক্ষে বল অথবা যুগের প্রয়োজনীয়তা নিরিখে; তওরাতের যে শিক্ষা এর সর্বশক্তি কিসাস ও প্রতিশোধ গ্রহণের ওপর নিয়োগ করেছে। যেমন চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। কিন্তু এর বিপরীতে রয়েছে ইঞ্জিলের শিক্ষা, এর পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত ছিল ক্ষমা, ধৈর্য ও মার্জনা করার প্রতি। এমনকি এতে এতদূর জোর দেওয়া হয়েছে যে, কেউ এক গালে চড় মারলে অপর গালও তার সামনে পেতে দাও। কেউ অযথা এক ক্রোশ দূরে নিয়ে গেলে দুই ক্রোশ চলে যাও। জামা চাইলে আলখাল্লাও দিয়ে দাও। অনুরূপভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তওরাত ও ইঞ্জিলের শিক্ষায় এ বিষয়টি দৃষ্টিগোচর হবে যে, তওরাত অতিরিক্ত কাঠিন্যের পন্থা অবলম্বন করেছে এবং ইঞ্জিল (অবলম্বন করেছে) অত্যাধিক নমনীয়তার পন্থা। কিন্তু কুরআন শরীফ প্রত্যেক পরিবেশ ও পরিস্থিতির নিরিখে প্রজ্ঞাপূর্ণও মানানসই শিক্ষা দেয়। যেখানেই দেখো আর যে বিষয়েই পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রতিই দৃষ্টি দাও না কেন সেখানেই দেখবে, এটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে শিক্ষা দেয়। যদিও আমরা মানি যে, সবার শিক্ষার উৎস একই। কিন্তু এতে (এ বিষয়টি) কারো অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, তওরাত ও ইঞ্জিলের প্রতিটি কিতাব এক একটি দিকের প্রতি জোর দিয়েছে। কিন্তু মানব প্রকৃতির দাবি অনুযায়ী কেবল পবিত্র কুরআনই শিক্ষা দিয়েছে। এটি বলা যে, তওরাতের শিক্ষা বাড়াবাড়ির পর্যায়ের রয়েছে, তাই এটি খোদার পক্ষ থেকে নয়, এটি সঠিক নয়। আমাদের একথা বলাও ভুল যে, এ শিক্ষা খোদার পক্ষ থেকে নয়। তওরাতের এ শিক্ষাও খোদার পক্ষ থেকেই। আসল কথা হলো, সেই যুগের প্রয়োজনের নিরিখে এমন শিক্ষা অকার্যকর ছিল। এছাড়া তওরাত ও ইঞ্জিল যেহেতু কোনো স্থানের নির্ধারিত বিধানের মত ছিল। অর্থাৎ বর্তমানে যে ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া গিয়েছে তা ওই সময় অকার্যকর ছিল। সে যুগে সেই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল যা তওরাতে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া তওরাত বা ইঞ্জিল যেহেতু স্থানীয় বিধানের মত ছিল। অর্থাৎ ইঞ্জিল ও তওরাতের যে শিক্ষা তা সেই জায়গার জন্যই নির্ধারিত ছিল। এজন্য এগুলোর শিক্ষায় অন্যান্য দিক দৃষ্টিপটে রাখা হয় নি। কিন্তু পবিত্র কুরআন যেহেতু গোটা পৃথিবী এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য ছিল তাই এ শিক্ষাকে এমন স্তরে রাখা হয়েছে যা মানবপ্রকৃতির সঠিক দাবির সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল আর এটিই হলো হিকমত বা প্রজ্ঞা। কেননা হিকমত শব্দের অর্থ হলো وَضْعُ الشَّيْءِ فِيْ مَحَلِّهٖ, অর্থাৎ কোনো জিনিসকে এর যথাযথ স্থানে রাখা। অতএব কুরআন শরীফই এই হিকমত শিখিয়েছে।

যেভাবে তওরাত বর্ণনা করেছে (এটি) এক অন্যায্য কঠোরতার প্রতি জোর দেয় এবং প্রতিশোধ নেয়ার শক্তিকে বৃদ্ধি করে আর এর বিপরীতে ইঞ্জিল অযথা মার্জনার প্রতি জোর দেয় অথচ কুরআন শরীফ এদুটিকেই বাদ দিয়ে সত্যিকার শিক্ষা দিয়েছে جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ অর্থাৎ অন্যায়ের শাস্তি ঠিক ততটাই যতটা অন্যায় করা হয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষমা

করে আর তার ক্ষমার উদ্দেশ্য সংশোধন হয় (তাহলে) তার প্রতিদান তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। (সূরা আশ্ শূরা : ৪১)

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭-৪০)

এই সাহসিকতা ও নির্দশনের সাথে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সকল ধর্মের ওপর প্রমাণ করাই সে যুগে তাঁর কাজ ছিল যখন সেদেশে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল এবং চার্চের (ক্ষমতার) যুগ ছিল। তথাপি তিনি (আ.) প্রকাশ্যে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্বের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন আর কোনো ধরনের ভয়কে ধারেকাছেও ঘেষতে দেন নি। কেননা তিনি আল্লাহ্ তা'লার সেই প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ছিলেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা এযুগে মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে প্রেরণ করেছেন আর এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, এই শিক্ষাকে যেন তিনি ছড়িয়ে দেন।

তাঁর লেখা ও শিক্ষায় আমরা এসব বিষয়ই দেখতে পাই আর এ বিষয়কেই আজ আমরা জামা'তে আহমদীয়ার (সদস্যরা)ও আরো বেশি ছড়িয়ে দিচ্ছি। অথচ যারা জামা'তে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তারা বলে থাকে, আহমদীরা পবিত্র কুরআন বিকৃতির ও এর অবমানার অপরাধে লিপ্ত।

পবিত্র কুরআনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফের প্রয়োজনীয়তার একটি বড় দলিল হলো, এর পূর্ববর্তী, অর্থাৎ মূসার কিতাব তওরাত থেকে শুরু করে ইঞ্জিল পর্যন্ত সব কিতাবই কেবল একটি বিশেষ জাতি, অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে। এছাড়া পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বলে, এদের হেদায়েত সাধারণের উপকারের জন্য নয় বরং কেবল বনী ইসরাইল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পবিত্র কুরআনের দৃষ্টি রয়েছে সমগ্র পৃথিবীর সংশোধনের ওপর আর এটি কোনো বিশেষ জাতিকে সম্বোধন করে না। বরং সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে, এটি সমগ্র মানবজাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এবং সকলের সংশোধনই এর উদ্দেশ্য।

অতএব সম্বোধনের দিক থেকে তওরাত ও কুরআনের শিক্ষার মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন তওরাত বলে, হত্যা কোরো না এবং কুরআনও বলে, হত্যা কোরো না। বাহ্যত কুরআনে সেই আদেশেরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে বলে মনে হয় যা পূর্বেই তওরাতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটি পু নরাবৃত্তি নয়, বরং তওরাতের এই নির্দেশ কেবল বনী ইসরাঈলের জন্য প্রযোজ্য এবং শুধু বনী ইসরাইলকেই হত্যা করতে নিষেধ করে। অন্য (কোনো জাতির) সাথে তওরাতের কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু কুরআন শরীফের এ নির্দেশ সমগ্র পৃথিবীর সাথে সম্পৃক্ত এবংসমগ্র মানবজাতিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে নিষেধ করে। একইভাবে কুরআন শরীফের বিধিনিষেধের মূল উদ্দেশ্য হলো সমগ্র মানবজাতির সংশোধন কিন্তু তওরাতের উদ্দেশ্য কেবল বনী ইসরাঈল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ।"

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ৮৫)

তিনি (আ.) আরো বলেন, কুরআন তওহিদ এবং বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে নতুন কী এনেছে যা তওরাতে ছিল না- এটি পাদরিদের একটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত দাবি। বাহ্যত একজন অজ্ঞ ব্যক্তি তওরাত দেখে প্রতারিত হবে, কেননা তওরাতে তওহিদও রয়েছে আর ইবাদতের বিধিনিষেধ এবং বান্দার অধিকারের কথাও রয়েছে। তাহলে নতুন এমন কোন্ বিষয়টি কুরআনের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে? কিন্তু এতে সেই ব্যক্তিই প্রতারিত হবে যে আল্লাহ্‌র বাণী নিয়ে কখনোই চিন্তাভাবনা করে নি। এটি স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার নামগন্ধও তওরাতে নেই। যেমন- তওরাতে তওহিদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরগুলোর কোনো উল্লেখ নেই। অথচ কুরআন আমাদেরকে অবগত করে, বিভিন্ন মূর্তি, মানুষ, জীবজন্তু, মৌলিক উপাদান, গ্রহ-নক্ষত্র এবং শয়তানের পূজার্চনা থেকে আমাদের বিরত থাকার নামই তওহিদ নয় বরং তওহিদ তিনটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তর : সর্বসাধারণের জন্য, অর্থাৎ তাদের জন্য যারা খোদা তা'লার ক্রোধ থেকে মুক্তি পেতে চায়। দ্বিতীয় স্তর: বিশিষ্ট লোকের জন্য, অর্থাৎ তাদের জন্য যারা সর্বসাধারণের তুলনায় অধিক ঐশী নৈকট্য লাভের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী। আর তৃতীয় স্তর : বিশিষ্টদেরও বিশেষের জন্য যারা নৈকট্যের চরম মার্গে উপনীত হতে চায়। তওহিদের প্রথম স্ত র হলো,খোদা ভিন্ন অন্য কারো উপাসনা না করা এবং সসীম ও সৃষ্ট বলে মনে হয় এমন প্র তিটি জিনিসের উপাসনা থেকে বিরত থাকা তা পৃথিবী কিংবা আকাশেই থাকুক না কেন। তওহিদের দ্বিতীয় স্তর হলো, নিজের এবং অন্যদের সকল কাজে খোদা তা'লাকেই প্রকৃত কার্যনিবাহক মনে করা এবং উপায় উপকরণকে এতটা গুরুত্ব না দেওয়া যাতে তা খোদা তা'লার শরীক সাব্যস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ এটি বলা যে, যায়েদ না হলে আমার এই ক্ষতি হয়ে যেত এবং বকর না হলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। মানুষের ওপর নির্ভরশীলতাও শিরক আর এটি তওহিদ পরিপন্থি। যায়েদ ও বকরকে যদি সত্যিকার অর্থে ই বিশেষ কিছু মনে করে এসবকথা বলা হয় তাহলে এটিও শিরক। তওহিদের তৃতীয় স্তর হলো খোদা তা'লার ভালোবাসায় স্বীয় প্রবৃত্তিরকামনা বাসনাকে পদদলিত করা এবং নিজ সত্তাকে তাঁ র শ্রেষ্ঠত্বের সামনে বিলীন করে দেওয়া। এই তওহিদ তওরাতের কোথায় রয়েছে? অনুরূপভাবে তওরাতে জান্নাত ও জাহান্নামের কোনো উল্লেখই পাওয়া যায় না। সম্ভবত কোথাও কোথাও ইঙ্গিত রয়েছে। একইভাবে তওরাতের কোথাও খোদা তা'লার পূর্ণাঙ্গীন গুণাবলীর উল্লেখ পরিপূর্ণ রূপে পাওয়া যায় না। তওরাতে যদি এমন কোনো সূরা থাকত যেমনটি কুরআন শরীফে রয়েছে, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۔ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۔ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ [অর্থাৎ তুমি বল, তিনিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্ । আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) সর্বনির্ভরস্থল। তিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। (সূরা ইখলাস সম্পূর্ণ)। তাহলে খ্রিষ্টানরা হয়তো এই সৃষ্টি পূজার বিপদ থেকে বিরত থাকত। অনুরূপভাবে অধিকারের স্তরগুলোকে তওরাত পুরোপুরি বর্ণনা করে নি। কিন্তু কুরআন এই শিক্ষাকেও চরম উৎকর্ষ দান করেছে। উদাহরণস্বরূপ এটি (অর্থাৎ কুরআন) বলে, اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى অর্থাৎ খোদা তা'লা নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করো এবং এর চেয়ে অগ্রগামী হয়ে তোমরা অনুগ্রহ করো আর এর চেয়েও অগ্রগামী হয়ে তোমরা মানুষের এমনভাবে সেবা করো যেভাবে কেউ আত্মীয়তারচেতনা নিয়ে সেবা করে। (সূরা নাহল : ৯১)। অর্থাৎ অনু গ্রহ করার মানসিকতায় নয় বরং মানবজাতির প্রতি তোমাদের সহানুভূতি যেন প্রকৃতিগত হয়, যেভাবে একজন মা তার সন্তানের (প্রতি সহানুভূতি) রাখে।অনুরূপভাবে তওরাতে খোদা তা'লার সত্তা, তাঁর একত্ববাদ এবং পূর্ণাঙ্গীন গুণাবলীকে যৌক্তিক দলিল দিয়ে প্রমাণ করে দেখান নি। কিন্তু কুরআন শরীফ এই সকল বিশ্বাস আর একই সাথে এলহামের প্রয়োজনীয়তা এবং নবুওয়াতকে বিভিন্ন যৌক্তিক দলিলের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক বিষয়কে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করে সত্যান্বেষীদের জন্য একে বুঝা সহজ করে দিয়েছে আর এসব যুক্তিপ্রমাণ কুরআন শরীফে এমন পূর্ণাঙ্গীনরূপে পাওয়া যায় যা (উপস্থাপন করার মত) সাধ্য কারো নেই। যেমন, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে এমন কোনো যুক্তিপ্রমাণ সৃষ্টি করতে পারে যা কুরআনে নেই।

এছাড়াও কুরআন শরীফের প্রয়োজনীয়তার একটি বড় দলিল হলো, এর পূর্ববর্তী, অর্থাৎ মূসার কিতাব তওরাত থেকে শুরু করে ইঞ্জিল পর্যন্ত সব কিতাবই কেবল একটি বিশেষ জাতি, অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে। এছাড়া পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা দেয়, এদের হেদায়েত সর্ব সাধারণের উপকারের জন্য নয় বরং কেবল বনী ইসরাইল পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পবিত্র কুরআনের দৃষ্টি রয়েছে সমগ্র পৃথিবীর সংশোধনের ওপর আর এটি কোনো বিশেষ জাতিকে সম্বোধন করে না। বরং সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে, এটি সমগ্রমানবজাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে এবং সকলের সংশোধনই এর উদ্দেশ্য।"

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন খণ্ড-১৩, পৃ: ৮৩-৮৫)

পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কিত আরো উদ্ধৃতি রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

****

(১ম পাতার পর....)

পর সন্ধ্যায় আমরা বাসার দিকে ফিরে আসার সময় একটি কবরের সামনে যে ব্যক্তিকে পুরোপুরি সিজদারত অবস্থায় দেখলাম, তিনি ছিলেন ফিরিঙ্গি মহল মাদ্রাসার একজন শিক্ষক। আমি তাঁকে দেখে আশ্চর্য হলাম যে এই ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করেও তার মূল্যায়ন করল না; কবরে সিজদা করতে শুরু করেছে। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে মুসলমানদের এই কারণেই ইহুদীদের কথা উল্লেখ করেছেন যে একদিন তোমরাও এমনটি করতে আরম্ভ করবে।

(তফসীর কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪, কাদিয়ান থেকে মূদ্রিত)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Abdur Rashid, Basantpur, 24 PGS (S)**

(২পাতার পর....)

যে, এই একশ বছরে লাজনারা কতটা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পেরেছে, নিজেদেরকে বয়আতকে স্বার্থক করে তুলতে পেরেছে এবং এ বিষয়ে চেষ্টা করেছে এবং কতটা নিজেদের সন্তান ও ভবিষ্যত প্রজন্মকে বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষাকারী হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাবীসমূহ মান্যকারী ও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে তার সমীক্ষা করতে হবে। আমরা যদি এই অনুসারে নিজেদের ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রতিপালন করে থাকি, তবে নিঃসন্দেহে লাজনা ইমাউল্লাহর সদস্যরা আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা। অতএব, আজ এই আত্মপর্যালোচনা করা প্রয়োজন এবং যে সমস্ত খামতি থেকে গেছে, সেখানে সংকল্পবদ্ধ হন যে, আপনারা আগমী শতাব্দীতে এই অঙ্গীকার নিয়ে পদার্পন করবেন যে, আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষাকারী হিসেবে গড়ে তুলবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।"

এক বছর পূর্বে সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লাজনা ইমাউল্লাহ্র সংগঠনটি গঠনের সময় এই সংংগঠনের যে সমস্ত উদ্দেশ্যাবলীর কথা বর্ণনা করেছিলেন এবং যে যে বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, সেই সব বিষয়ই হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনা এবং সঠিক অর্থে সন্তানের তরবীয়ত করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন। এই উপলক্ষ্যে সৈয়্যদাহ আমাতুল হাঈ (রা.)কে বিশেষভাবে দোয়ায় স্মরণ রাখা উচিত, কেননা লাজনা ইমাউল্লাহ্র সংগঠনটি গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট অবদান ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.) বলেন-

'আহমদী মহিলাদের ইতিহাসে হযরত সৈয়্যদাহ আমাতুল হাঈ (হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)-এর দ্বিতীয়া স্ত্রী]-এর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আর আমাদের হৃদয় ভালবাসা সহকারে তাঁর নাম স্মরণ করে দোয়া করবে। কেননা, আহমদী মহিলাদের সফলতা ও সমৃদ্ধির জন্য তাঁর বিশেষ ব্যকুলতা ছিল যা অবশেষে লাজনা ইমাউল্লাহ্র বিশ্বজনীন সংগঠন গঠনের প্রেরণা জোগায়।.... মহিলাদের মধ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহর কুরআনের দরস অব্যাহত রাখার কৃতিত্বও তাঁরই আর আহমদী মহিলাদেরকে যথারীতি একটি সংগঠনের তিনিই ছিলেন পথিকৃত। এটি তাঁর নশ্বর জীবনের অক্ষয় কীর্তি ছিল যা তাঁর নামকে অমর করে রাখবে।

আল্লাহ্ তা'লা এই সংগঠনটিকে অমর করুন। এই সংগঠন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং খলীফাগণের প্রত্যাশা ছাপিয়ে যাক আর নতুন শতাব্দীতে নতুন সংকল্প ও উদ্যম নিয়ে নতুন গন্তব্যের দিয়ে আগুয়ান হোক। আমীন।

****

(এটি) এজন্য যে, দু'জন নারীর একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করাবে। আর নারীদের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত যেসব বিষয় রয়েছে সেক্ষেত্রে হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.) শুধুমাত্র একজন মহিলার সাক্ষীর কারণে সেই বিবাহিত দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান; কারণ তিনি সেই দম্পতিকে অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে উভয়কে দুধ পান করিয়েছিলেন। অতএব হযরত উকবাহ্ বিন হারেস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি (রা.) আবু ইহাব বিন আযীয এর কন্যাকে বিয়ে করেন এরপর একজন মহিলা এসে বলেন, আমি উকবাহ্কে এবং যাকে তিনি বিয়ে করেছেন সেই মহিলাকে দুধ পান করিয়েছি (অতএব তারা হল, দুধ ভাই-বোন; তাদের মাঝে বিয়ে বৈধ নয়) উকবাহ্ বলেন, তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছ তা আমি জানি না আর তুমি (এর) পূর্বে কখনও এ সম্পর্কে বলোও নি। এরপর উকবাহ্ (রা.) বাহনে আরোহণ করে মহানবী (সা.)-এর কাছে মদীনায় যান এবং তাঁর সমীপে (এই মাসলা) সম্পর্কে জানতে চান। তখন মহানবী (সা.) বলেন, "এখন যেহেতু একথা বলে দেয়া হয়েছে তাই তুমি কীভাবে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখতে পারো? অতএব উকবাহ্ (রা.) সেই মহিলাকে ছেড়ে (অর্থাৎ তালাক) দেন এবং তিনি (মহিলা) অন্য কোনো পুরুষকে বিয়ে করেন। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল্ ইলম, বাব: আর্ রিহ্লাতি ফিল্ মাসআলাতিন্ নাযিআতি ওয়া তা'লীমি আহলিহি)

তালাক বা খোলা'র যতটুকু সম্পর্ক, এক্ষেত্রেও কোনো ভিন্নতা বা পার্থক্য নেই। বরং এটি ইসলামের অনুগ্রহ যে, ইসলাম পুরুষকে তালাক দেওয়ার অধিকার দেয়ার পাশাপাশি মহিলাকেও খোলা নেওয়ার অধিকার দিয়েছে। এক্ষেত্রেও নারী-পুরুষকে সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। পুরুষ যখন তালাক দেয় তখন মহিলাকে সবধরনের আর্থিক প্রাপ্য তাকে দিতে হয়। এছাড়া পূর্বে সে তার স্ত্রী'কে যেসব আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে তা থেকে কিছুই ফেরত নিতে পারে না।

অনুরূপভাবে মহিলা যখন স্বেচ্ছায় স্বামীর কোনো অপরাধ ছাড়াই তার কাছ থেকে খোলা নেয় তখন তাকেও স্বামীর বিভিন্ন আর্থিক অধিকার যেমন, দেন মোহর ইত্যাদি ফেরত দিতে হয়। কিন্তু স্ত্রীর খোলা নেয়ার ক্ষেত্রে যদি স্বামীর অন্যায়-অবিচার প্রমাণিত হয় সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে এই অতিরিক্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে, সে দেনমোহর পাবারও অধিকার রাখে। সবদিক বিবেচনা করে কাযা বা বিচার বিভাগ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

আহলে কিতাবকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে ওলীর প্রয়োজন এবং পুরুষের একাধিক বিয়ে করতে পারার বিষয়ে মূলত নারীর নিরাপত্তা, সম্ভ্রম ও সম্মানের বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তুলনামূলকভাবে নারীকে পুরুষের চেয়ে নাজুক বা দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন এবং তার স্বভাবে প্রভাব গ্রহণ করার উপকরণ বিদ্যমান রেখেছেন। কাজেই, একজন মুসলমান নারীকে আহলে কিতাব পুরুষকে বিয়ে করতে বারণ করে মূলত তার ধর্মের সুরক্ষা করা হয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে কনের সম্মতির পাশাপাশি তার ওলীর সম্মতিকে আবশ্যক করার মাধ্যমে অন্যান্য উপকারের মধ্যে একটি উপকার হল, একজন সাহায্যকারী ও নিরাপত্তাদাতা সরবরাহ করা। অর্থাৎ মহিলার বিয়ের পর তার শ্বশুরকূল যেন এ বিষয়ে সতর্ক থাকে যে, (এই) মহিলা একা নয় বরং তার খোঁজ-খবর নেওয়ারও মানুষ আছে। মহিলাকে একই সময়ে একটি বিয়ে করার অনুমতি দিয়ে ইসলাম তার পবিত্রতা বা সম্ভ্রমের সুরক্ষা করেছে আর মানুষের আত্মাভিমান এবং ষোলোআনা মানব স্বভাব সম্মত নির্দেশ দিয়েছে। যে হাদীসে জাহান্নামে মহিলাদের বেশি থাকার উল্লেখ রয়েছে সেখানে মানুষ এই হাদীসের অনুবাদ বা মর্ম বুঝতে ভুল করেছে। এই হাদীসের অর্থ আদৌ এটি নয় যে, জাহান্নামে নারীদের আধিক্য হবে। বরং মহানবী (সা.) বলেছেন,

" আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে, সেখানে আমি এমন মহিলাদের আধিক্য দেখেছি যারা তাদের স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ সেসব মহিলা তাদের কর্মের কারণে আগেই জাহান্নামে ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ মহিলা ছিল এমন, যারা তাদের স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ ছিল। কাজেই, প্রথমতঃ এই হাদীসের এই অর্থ কখনওই ঠিক নয় যে, জাহান্নামে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশি হবে। দ্বিতীয়তঃ এখানে সেসব মহিলার জাহান্নামে যাওয়ার কারণও বলে দেওয়া হয়েছে যে, তারা এমন মহিলা যারা কথায় কথায় খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজির প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যা তাদের স্বামীদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি করেছেন।

এরপর এর বিপরীতে বিভিন্ন হাদীসে নেক ও পুণ্যবতী নারীদের পদতলে জান্নাত হওয়ার সুসংবাদও শোনানো হয়েছে, যা কোনো পুরুষের সম্পর্কে বর্ণিত হয় নি।

এছাড়া ইসলাম নারী ও পুরুষদের বিভিন্ন অধিকার ও দায়িত্ব তাদের প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করেছে। পুরুষকে বাধ্য করেছে সে যেন কঠোর পরিশ্রম করে এবং পরিবারের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে। (আর) মহিলাকে বলেছে, সে যেন বাড়িঘর ও সন্তান-সন্ততির সুরক্ষা করে এবং তাদের উত্তম তরবিয়ত করে। মোটকথা, বাইরের দৌড়-ঝাঁপের জন্য পুরুষকে তার বিভিন্ন (দৈহিক) যোগ্যতার নিরিখে নির্বাচন করা হয়েছে আর মহিলার স্বভাব অনুযায়ী এবং তার সম্ভ্রমকে দৃষ্টিতে রেখে বাড়ির নেতৃত্ব তার স্কন্ধে অর্পণ করেছে।

মহানবী (সা.)-এর বক্তব্য হল, মহিলাদের মধ্যে ধর্ম ও বিজ্ঞতার দিক থেকে একপ্রকার ঘাটতি বা কমতি রয়েছে। এতে কোনোপ্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই, কেননা এটিও হুবহু মহিলাদের প্রকৃতিসম্মত বিষয়। ধর্মীয় বিষয়ে ঘাটতির কথা তো মহানবী (সা.) স্বয়ং বলে দিয়েছেন যে, তার জীবনের একটি বড় অংশে তার ওপর প্রত্যেক মাসে এমন কিছু দিন আসে যখন তার সকল প্রকার ইবাদত থেকে অবকাশ থাকে। আর অনুধাবন করলে বুঝা যায়, এটিও তার প্রতি খোদা তা'লার একপ্রকার অনুগ্রহ। যদিও বিজ্ঞতায় ঘাটতির কথাদ্বারাও মহিলার অসম্মান করা হয় নি বা তাকে তুচ্ছ করা হয় নি বরং এর অর্থ হল, মহিলাদের সারল্য। বর্তমান বিশ্বে যার প্রমাণ স্বয়ং মহিলারাই দিয়ে দিয়েছে যে, তারা খুবই সরল বা সাদাসিধে। পাশ্চাত্য জগতের পুরুষরা তাদেরকে স্বাধীনতার প্রলোভন দেখিয়ে যেভাবে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে তা পরম সত্যবাদী রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এই উক্তির সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ।পুরুষরা নিজেদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য তাকে (অর্থাৎ মহিলাকে) বাড়ির চার দেওয়াল থেকে বের করে বাইরে বাজারে এনে দাঁড় করিয়েছে। অথচ ইসলাম রুটি-রুজির দায়িত্ব পুরুষের স্কন্ধে অর্পণ করেছিল, এক্ষেত্রেও পুরুষরা মহিলাদের সরলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের দায়িত্ব তাদের সাথে ভাগ করে তাদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। যেখানে তাকে (অর্থাৎ মহিলাকে) পুরুষের মতো কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন মন-মানসিকতার পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখীন হতে হয়, যারা অনেক সময় নিজেদের কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য বিভিন্নভাবে তার প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করে।

এছাড়া যদি প্রণিধান করা হয় তাহলে পাশ্চাত্য জগতে নারী-পুরুষের সম-অধিকারের শ্লোগান একটি বুলিসর্বস্ব দাবি মাত্র। এই পাশ্চাত্য জগতের এমন কোনো একটি দেশও নেই যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার জন্য সংসদীয় ব্যবস্থাপনায় পুরুষদের সম-সংখ্যক নারী রয়েছে। এই পাশ্চাত্য দেশেগুলোর অধিকাংশ জায়গায় কোনো চাকুরীর জন্য যে প্যাকেজ বা সুযোগ-সুবিধা একজন পুরুষকে দেওয়া হয় সাধারণত সেই একই কাজের জন্য তা একজন মহিলাকে দেয়া হয় না। আর এসব বিষয় মহিলাদের সরলতার অকাট্য প্রমাণ বহণ করে। পবিত্র কুরআন যেখানে পুরুষকে কাওয়্যাম (মহিলাদের ওপর পুরুষের অগ্রাধিকার) প্রদানের কথা বলেছে, সেখানে পবিত্র কুরআন স্বয়ং এর ব্যাখ্যাও দিয়ে দিয়েছে। একটি কারণ বর্ণনা করেছে যে, পারিবারিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য এক

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

কাদিয়ান থেকে এক আহমদী হুযুর আনোয়ার (আই.) কে লেখেন-

'আমার মা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর আমিই যেন তাঁকে গোসল দিই। কিন্তু আমার মা করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। সেই কারণে তাঁকে গোসল দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই কারণে আমি ভীষণ মর্মাহত। এই সম্পর্কে হুযুরের দিক-নির্দেশনা চাই যে, আমি কি সঠিক কাজ করেছি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আসল কথা হল সাধারণ পরিস্থিতিতে মহিলার গোসল মহিলা এবং পুরুষের গোসল পুরুষরাই দিয়ে থাকে। ব্যতিক্রম শুধু স্বামী-স্ত্রী। তারা একে অপরের গোসল দিতে পারে।

তাই আপনি নিজের মাকে গোসল না দিয়ে খুব ভাল কাজ করেছেন। আর যেমনটি আপনি লিখেছেন, এমনিতেও কোরোনার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাই চিকিৎসকদের নির্দেশ অনুসারে আপনি তাঁকে গোসল দেওয়ার অনুমতি পেতেন না। তাই এই কারণে কোনও ধরণের দুশ্চিন্তায় না ভুগে আল্লাহ্ তা'লার কাছে আপনার মায়ের ক্ষমা ও করুণা লাভের দোয়া করুন। আপনার সমস্ত আত্মীয়স্বজনদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য দান করুন এবং তাঁর পুণ্য ও দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন। আমীন।

জার্মানী থেকে এক আহমদী ঋণের লেন-দেন করার সময় সাক্ষী রাখার বিসয়ে সূরা বাকারার একটি আয়াতের আলোকে মহিলাদের সাক্ষীর সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার(আই.)-এর কাছে দিক-নির্দেশনা চান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালের ২১ শে ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে লেখেন-

ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে ইসলামী শিক্ষার উপর যে সমস্ত বড় বড় আপত্তি করা হয়, তার মধ্যে একটি আপত্তি হল ইসলাম পুরুষের তুলনায় মহিলার সাক্ষীকে অর্ধেক গণ্য করে মহিলাকে নিম্নশ্রেণীর আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু এই আপত্তিও অন্যান্য আপত্তির ন্যায় ইসলামের শিক্ষার তাৎপর্য ও মর্মার্থ অনুধাবন না করে অকারণ খাড়া করা হয়েছে।

বস্তুত, কুরআন করীম কোথাও একথা বলে নি যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সাক্ষী অর্ধেক। বরং কুরআন করীমের প্রতি গভীর অভিনিবেশ করলে দেখা যাবে যে সব বিষয় মহিলাদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রাখে, সেই সব বিষয়ে যেভাবে পুরুষের সাক্ষী গ্রহণ করা হয়েছে, অনুরূপভাবে মহিলার সাক্ষীও গ্রহণ করা হয়েছে। সূরা নহলের স্বামী স্ত্রীর মাঝে 'লান'-এর পরিস্থিতি দেখা দিলে সাক্ষী দানের যে পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে তাতে মহিলা এবং পুরুষ উভয়ের সাক্ষী ও হলফ এর মধ্যে কোনও তারতম্য করা হয় নি। বরং উভয়ের থেকে একই পরিণাম বের করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন-

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ○ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ○ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ○ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ○ (سورة النور: 7

এবং যাহারা নিজেদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তাহারা নিজেরা ছাড়া তাহাদের নিকট অন্য কোন সাক্ষী থাকে না, তাহা হইলে তাহাদের প্রত্যেকের এইরূপ সাক্ষ্য হওয়া উচিত যে, সে আল্লাহ্‌র নামে চারিবার কসম খাইয়া সাক্ষ্য দিবে যে, সে সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা নুর: ৭)

অনুরূপভাবে হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, এক মহিলা সাক্ষী দেয় যে সে এক দম্পতির উভয়কে দুধ পান করিয়েছে। হুযুর (সা.) মহিলার এই সাক্ষী পেয়ে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে দেন। হযরত আকবা বিন হারিস (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি আবু আহাব বিন আযিজ -এর কন্যাকে বিয়ে করেন। এরপর এক মহিলা এসে বলে,' আমি আকবা এবং তার স্ত্রীকে, যাকে আকবা বিয়ে করেছে, দুধ পান করিয়েছি। (ফলে তারা দুধ সম্পর্কে ভাই-বোন, যাদের মধ্যে নিকাহ বৈধ নয়)। আকবা বলেন, আমি জানি না যে তুমি আমাকে দুধ পান করিয়েছ কি না। আর তুমিও আমাকে (এর পূর্বে) কখনও জানাও নি। এরপর আকবা বাহনে চড়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে মদীনা আসেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর নিকট বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি (সা.) বললেন, যেহেতু এই কথাটি বলে দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে তুমি কিভাবে তাকে নিজের নিকাহ বন্ধনে রাখতে পার? আকবা সেই মহিলাকে মুক্ত করে দেন এবং অপর এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ করে নেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইলম)

যতদূর ঋণ লেনদেনের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সাক্ষীর প্রসঙ্গটি রয়েছে, এক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, এই বিষয়টি যেহেতু পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্কিত, মহিলাদের সঙ্গে এর সরাসরি সম্পর্ক থাকে না, সেই কারণে নির্দেশ রয়েছে যে, যদি এক্ষেত্রে সাক্ষীর জন্য নির্দিষ্ট কোনও পুরুষ না থাকে, তবে একজন পুরুষের সঙ্গে দুইজন মহিলাকে রাখা উচিত, যাতে সাক্ষ্যদানকারী মহিলা যদি নিজের সাক্ষ্য ভুলে যায়, সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় মহিলা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

অর্থাৎ এখানেও একজন মহিলাই সাক্ষী দিচ্ছে, শুধুমাত্র এই বিষয়টির ক্ষেত্রে তাদের সচরাচর তেমন সম্পর্ক না থাকার কারণে তার ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা দৃষ্টিপটে রেখে সতর্কতা হিসেবে দ্বিতীয় মহিলাকে তার সাহায্য এবং সাক্ষীর বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য রাখা হয়েছে। কুরআন করীমের বর্ণনাও এই অর্থকেই সমর্থন করে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ..... وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰىهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدٰىهُمَا الْاُخْرٰى

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! যখন তোমরা নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে লেন-দেন কর..... এবং তোমাদের পুরুষদের মধ্য হইতে দুইজনকে সাক্ষী রাখ,কিন্তু যদি দুইজন না জোটে তাহা হইলে উপস্থিত দর্শকগণের মধ্য হইতে যাহাদিগকে তোমরা পছন্দ কর একজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক (সাক্ষী থাকিবে), এই জন্য যে, দুইজন স্ত্রী লোকের মধ্যে যদি একজন ভুলিয়া যায় তাহা হইলে অপরজন স্মরণ করাইয়া দিবে।

(সূরা বাকারা: ২৮৩)

অতএব, ঋণের লেনদেনের বিষয়েও মহিলা হোক বা পুরুষ, উভয়ের সাক্ষী ও গুরুত্ব সমান। কিন্তু যেহেতু আর্থিক বিষয়ে লেননেদের ক্ষেত্রে সচরাচর মহিলাদের সম্পর্ক থাকে না, সেই কারণে সাক্ষ্যদানকারী মহিলাকে সাহায্য করার জন্য, অর্থাৎ যদি সে লেনদেনের বিবরণ ভুলে যায় তবে সে বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে অপর একজন জন মহিলাকে সঙ্গে রাখার উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও সাক্ষীর ভুলে যাওয়ার ফলে লেনদেন সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কারো অধিকার খর্ব না হয়।

প্রশ্ন: জর্ডান থেকে এক ভদ্রলোক সূরা রহমানের আয়াত لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ উল্লেখ করে হুযুর আনোয়ারের কাছে জানতে চান যে, এখানে জিন্ন বলতে কোন জিনিষকে বোঝানো হয়েছে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২১ সালের ১৮ই অক্টোবার তারিখের চিঠিতে লেখেন-

কুরআন করীম ও হাদীসে জিন শব্দের ব্যপক ব্যবহার ভিন্ন অর্থে লক্ষ্য করা যায়। আর প্রতিটি স্থানে প্রেক্ষাপট অনুসারে এই শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন হবে। জিন্ন শব্দের মূল অর্থ লুকিয়ে থাকা বস্তু-সেটা তার গঠনগত দিক থেকে হতে পারে, বা বৈশিষ্টগত দিক থেকে। আর কাল ও পাত্র ভেদে এর অর্থও পরিবর্তিত হতে থাকে। আর সকল অর্থে এর মধ্যে গোপন থাকা এবং অন্তরালে থাকার অর্থটি প্রধান।

জিন ধাতু থেকে তৈরী বিভিন্ন শব্দের মধ্যে নিম্নরূপ শব্দগুলি লক্ষ্যনীয়। যেমন- জানীন বলা হয় মাতৃগর্ভে লুক্কায়িত শিশু। 'জুনুন' বলা হয় সেই ব্যধিকে যা বিবেক বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। জানান বলা হয় বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকা হৃদয়। জান্নাতুন বলা হয় সেই বাগানকে যার নিবিড় ছায়া মাটিকে ঢেকে রাখে। মুজান্না বলা ঢালকে, যার পিছনে লুকিয়ে যোদ্ধা যুদ্ধ করে। জাননু বলা হয় সাপকে যা মাটির মধ্যে লুকিয়ে থাকে। আর জুন্নাতুন বলা হয় ওড়নাকে যা মাথা ও শরীরকে ঢেকে রাখার অর্থে ব্যবহৃত হয়।

এছাড়াও জিন্ন শব্দটি পর্দাশীল মহিলাদের জন্যও ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও এমন বড় বড় নেতা ও প্রমুখদের জন্যও জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয় যারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে থাকে না। আবার এমন জাতির মানুষের জন্যও জিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয় যারা ভৌগলিকদিক থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা আর পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে বিছিন্ন হয়ে আছে।

অনুরূপভাবে অন্ধকারে বসবাসকারী জীবজন্তুদের জন্য এবং অনেক সূক্ষ্ম কীট পতঙ্গ ও জীবাণুর জন্যও এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) রাত্রিতে খাবার বাসন ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা)

এবং শুষ্ক হাড় দ্বারা ইসতেঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন এবং এটিকে জিন্ন অর্থাৎ পিপড়ে, উই পোকা এবং অন্যান্য জীবাণুর খাদ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)

এছাড়াও জিন্ন শব্দটি গোপন অপবিত্র আত্মা অর্থাৎ শয়তান এবং গোপন পবিত্র আত্মাদের জন্য অর্থাৎ ফিরিশতাদের জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমনটি বলা হয়েছে-

مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ

(সূরা জিন্ন, আয়াত: ১২)

অতএব, যেমনটি বলা হয়েছে, সর্বক্ষেত্রে প্রেক্ষাপট অনুসারে এই শব্দের অর্থ হবে। আপনার প্রশ্নে সূরা রহমানের আয়াত-

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ এ জান্নুন শব্দে 'ইনস' এর মোকাবেলায় যে জিন্নের উল্লেখ করা হয়েছে, তার দ্বারা বিশিষ্ট ও প্রভাবশালী নেতা ও বড় বড় সর্দারদের বোঝানো হয়েছে। আর এই আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন এক জান্নাত তৈরী করে রেখেছেন যেখানে পুণ্যবানদের জন্য এমন সব আশিসরাজি থাকবে যা বিশুদ্ধরূপে সেই সব জান্নাতীদেরকেই দেওয়া হবে আর ইতিপূর্বে এই নেয়ামত সাধারণ কিম্বা

বিশেষ, প্রত্যেক প্রকারের বান্দাদের হস্তক্ষেপ থেকে পবিত্র হবে।

প্রশ্ন: এক বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে জানতে চেয়েছেন, ইসলামে বিভিন্ন প্রাণীর মাংশ কীসের ভিত্তিতে হালাল ও হারাম আখ্যা দেয়া হয়? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১১ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের পত্রে এর নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, কোনো বস্তু বা জিনিসের হারাম বা হালাল হওয়া সম্পর্কে ইসলাম ধর্মের নীতি হল, প্রত্যেক সেই বিষয় যা করতে শরীয়ত বারণ করে নি তা হালাল বা বৈধ। অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "মূলনীতি হল, সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো কিছু প্রমাণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সব বস্তুই হালাল।"

(মালফূযাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭৪)

পবিত্র কুরআন মৃত, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংশ এবং আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য কারও নামে জবাইকৃত প্রাণীকে হারাম বা অবৈধ আখ্যা দিয়েছে।

(সূরা আল্ আনআম: ১৪৬)

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত এই চারটি জিনিস বা বস্তুকে অবৈধ বা হারাম বলা হয়। যদিও বিভিন্ন জিনিস খেতে মহানবী (সা.) বারণ করেছেন, সেগুলোকে নিষিদ্ধ বলা হয়। যেমন, যেসব শিকারী প্রাণী– তা নিষিদ্ধ। এতে হিংস্র প্রাণী, শিকারী পাখি ইত্যাদি সবই অন্তর্ভুক্ত। এসব জিনিসের নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি হাদীসসম্মত। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে,

"মহানবী (সা.) সবধরনের হিংস্র জন্তু এবং সবধরনের নখরবিশিষ্ট পাখি খেতে বারণ করেছেন। (সহীহ্ মুসলিম)

একইভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

" হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) খায়বারের যুদ্ধের সময় পালিত গাধার মাংস খেতে বারণ করেছেন।

(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মাগাযী)

হারাম এবং নিষিদ্ধের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন,

"এ বিষয়টি স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী শরীয়তে যেসব বস্তু বা জিনিস খেতে বারণ করা হয়েছে তা দু'প্রকার। (এক) হারাম ও (দুই) নিষিদ্ধ। অভিধানের নিরিখে হারাম শব্দটি উভয় প্রকার বা ধরনের জন্যই প্রযোজ্য। কিন্তু পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে (অর্থাৎ সুরা আল্ বাকারা: ১৭৪) কেবলমাত্র চারটি জিনিসকে হারাম আখ্যা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস এবং সেসব জিনিস যা আল্লাহ্‌র নাম ছাড়া অন্য কারও নামে জবাই করা হয়। এগুলো ছাড়াও শরীয়তে অন্য কিছু জিনিষ আহার করতে বারণ করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো নিষিদ্ধ জিনিষের তালিকাভুক্ত হলেও পবিত্র কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী হারাম হবে না।

এসব বিধি-নিষেধ এই আয়াত বা অন্যান্য আয়াতের বিষয়বস্তুর পরিপন্থী নয়। কেননা, যেভাবে বিভিন্ন ধরনের আদেশ রয়েছে, কতক ফরয, কতক ওয়াজিব আবার কতক সুন্নত। একইভাবে নিষিদ্ধেরও প্রকারভেদ রয়েছে। একটি নিষিদ্ধ হচ্ছে মাহরুমাহ্, আরেকটি নিষিদ্ধ হচ্ছে মানিয়াহ্ বা বাধা দেয়া আরেকটি নিষেধ হচ্ছে তানযিহী বা মন্দ জিনিষ থেকে দূরে রাখা। অতএব, চারটি জিনিস হচ্ছে হারাম আর বাদবাকী হল নিষিদ্ধ। আর এর চেয়েও বড় কথা হল, যেগুলো সম্পর্কে তানযিহী রয়েছে মানুষের সেগুলো থেকে দূরে থাকাই উত্তম। হারাম আর নিষিদ্ধের মধ্যে পার্থক্য ততটা যতটা ফরয ও ওয়াজির এর মধ্যে। কাজেই, পবিত্র কুরআন যেসব জিনিষকে হারাম আখ্যা দিয়েছে সেগুলো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বা হারাম, কিন্তু যেগুলো খেতে মহানবী (সা.) বারণ করেছেন তা তুলনামূলকভাবে সেগুলোর চেয়ে কম নিষিদ্ধ। আর যেমনটি আমি বলেছি, বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে সেগুলোর দৃষ্টান্ত ফরয, ওয়াজিব এবং সুন্নতের সাথে তুলনীয়। হারাম হল তুলনার নিরিখে ফরযের মতো আর নিষিদ্ধ জিনিষ হল তুলনার দিক থেকে ওয়াজিব এর মতো। যেভাবে ফরয এবং ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য করা হয় এর শাস্তির নিরিখে। একইভাবে যেসব বস্তু নিষিদ্ধ হওয়ার ঘোষণা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে মানুষ যদি সেগুলো ব্যবহার করে বা ভক্ষণ করে তাহলে এর শাস্তি অধিক কঠোর হবে। আর যেসব বস্তু সম্পর্কে মহানবী (সা.) বারণ করেছেন তা ব্যবহার করলে (তুলনামূলকভাবে) তার থেকে কম শাস্তি হবে, কিন্তু উভয় অপরাধই শাস্তিযোগ্য এবং আল্লাহ্ তা'লার অসন্তুষ্টির কারণ হবে। হারাম কাজের অপরাধের কারণে মানুষের ঈমানের ওপর প্রভাব পড়ে আর এর পরিণাম অবশ্যই মন্দ হয়ে থাকে।

কিন্তু অন্যান্য বস্তু ব্যবহারের ফলাফল অবশ্যই মন্দ হলেও তা ঈমানশূন্যতার আকারে প্রকাশ পায় না। কাজেই দেখো! মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো কোনো ফিরকা আছে যারা এসব বস্তু বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও অজুহাতের আলোকে বৈধ জ্ঞান করে এবং সেগুলো ভক্ষণ করে যেমন, মালেকী ফিরকা। তাদের বিশ্বাস, এসব বস্তুর প্রভাব তাদের ঈমানের ওপর পড়ে না। আর তাদের মধ্যে অবিশ্বস্ততা এবং নোংরামী সৃষ্টি হয় না। বরং বিগত যুগে তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র ওলীও জন্ম নিতে থেকেছেন। অথচ শূকরের মাংস এবং মৃত ভক্ষণকারী কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র ওলী হিসেবে দেখা যাবে না। কাজেই, হুরমত বা হারামেরও বিভিন্ন পর্যায় বা ধাপ রয়েছে আর এই চারটি বস্তু ছাড়া বাকী সব কিছুই নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, যাকে সাধারণ পরিভাষায় হারাম বলা হয়ে থাকে নতুবা কুরআনের পরিভাষায় তা হারাম নয়।" (তফসীরে কবীর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৪০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হারাম ও হালালের দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

এটি খোদার প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করার নামান্তর যে, এটি হালাল না হারাম। খোদা তা'লা বলেছেন

حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

(সূরা আল্ বাকারা: ১৭৪)হাদীস শরীফে মহানবী (সা.) বলেছেন, শিকারী প্রাণী খাওয়া হারাম। হিংস্র জীবজন্তু, শিকারী পাখি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর এর চেয়ে অতিরিক্ত কোনো কিছুকে কারও হারাম ও হালাল বলার অধিকার নেই।

কিন্তু পৃথিবীতে যেহেতু সহস্র সহস্র প্রাণী রয়েছে তাই এই সমস্যা দেখা দেয় যে, এখন কোন্‌টা খাবে আর কোন্‌টা খাবে না। আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত সহজভাবে এই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (সূরা আন্ নাহল: ১১৫)

অর্থাৎ হালাল ও তৈয়্যব (তথা বৈধ ও পবিত্র) বস্তু খাও। এখন এখানে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, যে জিনিস তৈয়্যব বা পবিত্র তা খাও। অতএব প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক জাতিতে যেসব বস্তু বা জিনিষ উপাদেয় এবং পবিত্র আর ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা খায় তা খাও। এক্ষেত্রে সেসব ব্যতিক্রম যার কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে তা দৃষ্টিতে রাখা একান্ত আবশ্যক। তোতা পাখি খাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা আছে বলে জানা যায় না। কিন্তু আমি খাই না, কারণ আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা (এটি) খায় না। একদা এক ব্যক্তি আমার সামনে গুইসাপ রান্না করে নিয়ে আসে যে, খান। আমি বললাম, আপনি সানন্দে আমার দস্তরখানে বসে খেতে পারেন কিন্তু আমি খাবো না, কেননা সম্ভ্রান্তরা এটি খায় না।"

(বদর পত্রিকা, নাম্বার: ১৯, দশম খণ্ড, ৯ই মার্চ, ১৯১১, পৃ. ১)

প্রশ্ন: একজন মহিলা ইসলামে নারী ও পুরুষের সমঅধিকার প্রসঙ্গে নিজের কিছু জড়তা বা দ্বিধাদ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে ইসলামের বিভিন্ন নির্দেশ সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ জানান। এর উত্তরে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১১ই এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের পত্রে এসব বিষয়ের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর বলেন,

উত্তর: আপনার পত্রে উল্লিখিত দ্বিধাদ্বন্দ্ব মূলত ইসলামী শিক্ষামালা এবং মানব প্রকৃতি না বুঝার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে। ইসলাম কোথাও দাবি করে নি যে, নারী ও পুরুষ সকল ক্ষেত্রেই সমান। ইসলাম তো দূরে থাক মানব প্রকৃতিও সকল ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের সমান হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। তবে, ইসলাম অবশ্যই এই শিক্ষা দিয়েছে যে, পুণ্য বা সৎকর্ম সম্পাদনের ফলে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে পুরুষদেরকে স্বীয় পুরস্কাররাজি ও কল্যাণরাজিতে ভূষিত করেন, একইভাবে তিনি মহিলাদেরকেও স্বীয় পুরস্কাররাজি ও কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী করেন। যেমনটি তিনি বলেছেন,

"অতএব তাদের প্রতিপালক (এই বলে) তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্মকে আদৌ বিনষ্ট করবো না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা নারীই হোক। তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক রাখো। অতএব যারা হিজরত করেছে এবং নিজেদের বাড়িঘর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে এছাড়া আমার পথে যাদের কষ্ট দেওয়া হয়েছে অধিকন্তু যারা যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে, নিশ্চয় আমি তাদের দোষত্রুটি তাদের থেকে দূর করে দিব এবং নিশ্চয় আমি এমনসব জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবো, যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। (এটি) আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রতিদানস্বরূপ; আর আল্লাহ্‌র সন্নিধানেই রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার।' নারী ও পুরুষের যতটুকু সাক্ষী দেওয়ার সম্পর্ক, এমন বিষয়াদি যার সম্পর্ক পুরুষদের সাথে এবং সরাসরি মহিলাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এক্ষেত্রে যদি সাক্ষী প্রদানের জন্য নির্ধারিত পুরুষ উপস্থিত না থাকে তাহলে একজন পুরুষের পরিবর্তে দু'জন মহিলাকে (সাক্ষী) নির্ধারণ করার কারণ হল, যেহেতু এসব বিষয়ের সাথে মহিলাদের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই তাই সাক্ষী প্রদানকারী মহিলা যদি তার স্বাক্ষ্য ভুলে যায় তাহলে অন্য মহিলা যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। মোটকথা এক্ষেত্রেও সাক্ষী একজন মহিলাই। কেবলমাত্র তার এসব বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্ক না থাকার কারণে তার ভুলে যাওয়ার আশংকাকে দৃষ্টিপটে রেখে সাবধানতাবশে আরেকজন মহিলা তার সাহায্যার্থে এবং তাকে কথা স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষ্যও এই বক্তব্য ও মর্মেরই সমর্থন করে। অতএব বলছে,

(সূরা আল্ বাকারা: ২৮৩)

অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন নির্দিষ্টকালের জন্য পরস্পর ঋণের লেনদেন করো তখন তা লিখে রেখো। ... আর তোমাদের পুরুষদের দু'জনকে সাক্ষী রাখো। কিন্তু দু'জন পুরুষ না থাকলে সাক্ষীদের মাঝ থেকে যাদের তোমরা পছন্দ করো, একজন পুরুষ ও দু'জন নারী (সাক্ষী রাখো)।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 23 March, 2023 Issue No.12

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ ও আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ানে সেবাদানে ইচ্ছুক প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের শর্তাবলী

১) প্রার্থীর বয়স অনুর্দ্ধ ২৫ এবং কমপক্ষে ১৮ হতে হবে।২) শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চমাধ্যমিকে কমপক্ষ্যে ৪৫% নম্বর সহ উত্তীর্ণ হতে হবে।৩)উর্দু ও ইংরেজি টাইপিং-এ তুখড় হতে হবে। টাইপিং স্পীড মিনিটে অন্তত ২৫টি শব্দ হওয়া বাঞ্ছনীয়। ৪) এই ঘোষণার ২ মাসের মধ্যে যে সব আবেদন পত্র জমা পড়বে সেগুলিই বিবেচনাধীন হবে। ৫) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের জন্য পরীক্ষার পাঠ্যক্রম নিম্নরূপ হবে। প্রশ্ন পত্রের প্রত্যেকটি বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

প্রথম ভাগ: কুরআন করীম দেখে পড়া। প্রথম পারা অনুবাদ।
চল্লিশ জোয়াহের পারে, আরকানে ইসলাম, নামায (সম্পূর্ণ) (৩০ নম্বর)

২য় ভাগ: কিশতিয়ে নূহ, বারকাতুদ দোয়া, দ্বিনী মালুমাত
জামাতের আকিদা বিষয়ক প্রবন্ধ লেখনী।, দুররে সামীন (শানে ইসলাম) নযমগুচ্ছ থেকে নযম। (৩০ নম্বর)

৩য় ভাগ: উচ্চমাধ্যমিক সমমানের ইংরেজি। (২০ নম্বর)

৪র্থ ভাগ: মাধ্যমিক মানের গণিত। (কেরানী অফিস সম্পর্কিত প্রশ্ন) (২০ নম্বর)

৫ম ভাগ: সাধারণ জ্ঞান। (১০ নম্বর)

* কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবেই প্রত্যাশীকে নির্বাচন করা হবে। * লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রত্যাশীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। *প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। *প্রত্যাশী নির্বাচিত হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

(বি.দ্র: লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-এর দিনক্ষণ পরে জানানো হবে।)

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, আঞ্জুমান তাহরীকে জাদীদ ও আঞ্জুমান ওয়াকফে জাদীদ কাদিয়ান-এ মালি/কেয়ারটেকার/চৌকিদার/রাধুঁনি/নানবাই/খাদিম মসজিদ হিসেবে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি।

১) প্রার্থীর বয়স বয়স ১৮ বছরের বেশি ও ৪০ বছরের কম হতে হবে।

২) শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন শর্ত নেই। ৩) জন্ম-তারিখের জন্য স্বীকৃত শংসাপত্রের ফটোকপি দেওয়া আবশ্যক। কেন্দ্রীয় কর্মী নিয়োগ কমিটি দ্বারা আয়োজিত ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ হতে হবে। ৫) ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ প্রার্থীকে নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল ফিটনেস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেকে সুস্থ ও সবল প্রমাণ করতে হবে। ৬)প্রার্থীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজে বহন করতে হবে। ৭) নির্বাচন হলে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। ৮) প্রার্থীকে নাযারত দিওয়ানের পক্ষ থেকে দেওয়া নির্দিষ্ট ফর্ম, সরকারি জন্ম-শংসাপত্র, আধার কার্ড এবং জামাতের আই.এন.ডি কার্ড-এর ফটোকপি অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য অফিসে কাজের দিনগুলিতে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন। (সময়: সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা) ই-মেল: diwan@qadian.in

Nazarat Deewan, Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian
Pin-143516
Office: 01872-501130, 9682587713, 9682627592

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

৯ পাতার পর...

পক্ষকে অপর পক্ষের ওপর কিছুটা হলেও অগ্রাধিকার প্রদান করেছে আর দ্বিতীয় যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তা হল, (পুরুষরা) নিজেদের ধন-সম্পদ মহিলাদের পেছনে ব্যয় করে। এক পক্ষের অপর পক্ষের ওপর অগ্রাধিকারের কারণ একেবারেই মানব-প্রকৃতি সম্মত। কেননা আমরা যদি পার্থিব ব্যবস্থাপনার ওপর দৃষ্টিপাত করি তাহলে সর্বত্র এক পক্ষকে ওপরে আর অপর পক্ষকে তুলনামূলকভাবে নীচে দেখতে পাই। পৃথিবীতে যদি সবাই সমান হতো কিংবা এভাবে বলা যেতে পারে যে, সবাই যদি রাজা-বাদশাহ্ হয়ে যেত তাহলে পৃথিবী একদিনও চলতে পারতো না। এজন্যই আল্লাহ্ তা'লা কিছু মানুষকে বড় আর কিছু মানুষকে ছোট, কিছু মানুষকে ধনী এবং কিছু মানুষকে দরিদ্র বানিয়েছেন। আমরা এটিও দেখতে পাই যে, প্রত্যেক দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য একটি কেবিনেট বা মন্ত্রী পরিষদ থেকে থাকে, কিন্তু সেই দেশের সব মানুষই যদি সেই কেবিনেটের সদস্য হয় তাহলে সেই দেশ চলতেই পারবে না।

ঠিক একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা পারিবারিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য তুলনামূলকভাবে পুরুষদেরকে বেশি অধিকার দিয়েছেন। কিন্তু যেভাবে একজন রাষ্ট্রপ্রধান বা দেশপ্রধানের কেবিনেট বা মন্ত্রী পরিষদের অতিরিক্ত ক্ষমতার কারণে তুলণামূলকভাবে অতিরিক্ত দায়-দায়িত্বও বহণ করতে হয়, অনুরূপভাবে ইসলাম মহিলাদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে পুরুষদের ওপর অতিরিক্ত দায়িত্বও অর্পণ করেছে।

কাজেই, নারী-পুরুষের অধিকার ও দায়-দায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামব্যবস্থাপনা একেবারেই প্রকৃতিসম্মত আর এতে কোনোপ্রকার প্রতিবন্ধকতা নেই।

প্রশ্ন: একজন মহিলা খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র মজলিসে ইরফানে বর্ণিত একটি বক্তব্যের আলোকে চাচা এবং মামার সামনে পর্দা করা সম্পর্কে হুযূর

আনোয়ার (আই.)-এর কাছে নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করেন। এ সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১লা জুন, ২০২০ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন। হুযূর বলেন,

উত্তর: আপনি আপনার পত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র যে বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন তা সূরা নূরের ৩২ নাম্বার আয়াতের বরাতে মজলিসে ইরফানে এক প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত হয়েছে।

একথা সঠিক যে, এ আয়াতে বর্ণিত আত্মীয়-স্বজন যাদের সামনে পর্দা না করার জন্য মহিলাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে তাতে চাচা এবং মামা'র উল্লেখ নেই কিন্তু এই দু'জন মাহরাম আত্মীয়দের মধ্যেই গণ্য হন। যেমনটি হুযূর (রাহে.)ও তাঁর এই বক্তব্যে বলেছেন। আর সূরা নিসায় বর্ণিত কুরআনের নির্দেশ থেকেও এটি প্রমাণ হয়, কেননা তাদের উভয়ের সাথে বিবাহ বৈধ নয় বলে এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে মহানবী (সা.) তাঁকে চাচার সামনে পর্দা না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তবে, এর পাশাপাশি পর্দা সম্পর্কে একথাও দৃষ্টিপটে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী শিক্ষামালা অনুযায়ী মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও সকল পর্যায়ের আত্মীয়ের সামনে পর্দা না করার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শর্ত রয়েছে যা পরিস্থিতি সাপেক্ষে প্রযোজ্য। অতএব, সূরা নূরে যেসব মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সামনে পর্দা না করার অনুমতি রয়েছে, এদের মধ্যেও প্রত্যেক আত্মীয়ের অন্য আত্মীয়ের সামনে পর্দা না করার পৃথক পরিবেশ ও ভিন্ন পরিস্থিতি থাকতে হবে। কাজেই, স্বামীর সামনে পর্দা না করার যে সুযোগ রয়েছে তা এই আয়াতে বর্ণিত পিতা, পুত্র এবং ভাই প্রমূখের সামনে পর্দা না করার যে অনুমতি তা থেকে পৃথক। অতএব, যেভাবে এই আয়াতে বর্ণিত আত্মীয়-স্বজনের সামনে পর্দা করার বিভিন্ন পরিস্থিতি-পরিবেশ রয়েছে, একইভাবে অন্যান্য মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সামনেও পর্দা না করার যে অনুমতি রয়েছে তার মধ্যেও পরিস্থিতিভেদে পার্থক্য রয়েছে। আর এই বিষয়টিই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর উল্লিখিত বক্তব্যে বুঝাচ্ছেন যে, চাচা এবং মামা; যারা একই বাড়িতে একসঙ্গে বসবাসকারী আত্মীয়-স্বজন নন বরং বাইরের মানুষ- যদিও তারা মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের গণ্ডিভূক্তই হোন না কেন তথাপি তারা যখন (তোমাদের) বাড়িতে আসবে তখন মহিলারা যেভাবে একই বাড়িতে একসাথে বসবাসকারী পুরুষদের, যাদের মধ্যে স্বামী, পিতা-পুত্র প্রমুখ রয়েছেন- তাদের সামনে পর্দা করার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে Relax বা শিথিল থাকেন। বাইরে থেকে আগত মাহরাম পুরুষদের বিষয়ে তাদেরকে তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি সতর্ক থাকা উচিত, যদিও তাদের সামনে মুখমণ্ডল আবৃত করা হয় না কিন্তু মাথা ও বুক আবৃত করে এবং নিজেকে সামলে নিয়ে তাদের সামনে বসার নির্দেশ রয়েছে।

অতএব, এটি হল মূল বিষয় যা হুযূর (রাহে.) বর্ণনা করছেন, চাচা ও মামার সামনে পর্দা করার নির্দেশ দিচ্ছেন না।

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir